

অহিংসা

শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৬, এম,
লাইফেসাই

এক

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিন দিকটা তপোবনের মতো। বাকি দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি গড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মতো নির্জন আব শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশি নয়। তপোবনের বড়ো বড়ো গাছগুলির কোনো কোনোটা হয়তো শতাব্দীর বেশি সময় ধবিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শতাব্দেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাসুপুরের গা-ঘোঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতুনার বাগদিপাড়া পর্যন্ত এলোমেলাভাবে ছড়ানো আরও বড়ো আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ-বারোগুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভালো করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপবন, আমবাগান, কলাবাগান সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূর্বদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাখা বলিয়া, বোধ হয় আদরের আতিশয্যেই একটা ইকার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাখাই।

বড়ো আশ্চর্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থমথম করে, লোকে জল আটকানোব জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাখাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক-মাস ধরিয়া বোদে যে বালি তাতিয়াছে সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাখাই নদীর দুতবর্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড়ো রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, ক-দিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভালো করিয়া ভেজে নাই পর্যন্ত। কোনো পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোনো ডোবায় জল জমে নাই। রাখাই এত জল পাইল কোথায় ?

দূর দেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোনো বড়ো নদী সেই জল বহিয়া আনিয়া কোনো শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোনো শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এতসব রহস্যের সন্ধান কজনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজির দর্শনকামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও শহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শন দেয়, দর্শনের মনোমতো ব্যাখ্যাও শোনায়।

এবার যেদিন প্রথম রাখাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেল। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না, অন্যমনস্ক সে ইচ্ছা করিয়া হইয়াছে। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মতো বেঁধে, মধুর মতো মাখা হইয়া যায়, মধুপের মতো গুল্লন করে, শূন্যে শূন্যে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছে। অস্বস্তি বোধ করিতে

করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তিলাভ করে। তাই বটে, সাধুজি আজ অনামনক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজির মন নাই।

পুরুষরা চূপ করিয়া রহিল, মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিসফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে-পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নাবীর পার্থক্য স্বীকার করে, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার কবে না। এই সভায় যারা বসে তাদের মধ্যে যেমন ছোটোবড়ো নাই, জানা-অজানা নাই, আপন-পর নাই, তেমনই মেয়ে-পুরুষও নাই। অস্ত্র সাধুজির তাই নির্দেশ। তবু, মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা খুচাইবাব চেষ্ঠাও পুরুষদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। চালার নীচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা জায়গা গাছপালা কাটিয়া পবিত্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙাইয়া বাকাভাবে বোধ আসিয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় পড়িয়াছে, বড়ো তেজ এখনকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কমবয়সি বিধবা, গায়ের রংটা যাব আশ্চর্যবকমের ফবসা, মুখখানা সিঁদুরের মতো রাজা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বউটির গায়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে, হয় মূর্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিল, মেয়েদের গায়ে বোধ লাগছে বিপিন।

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনাবেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাশাও করিত। আজও অন্তরালে কবিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে আনমনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাতজোড় করিয়া বলিল, কী করব প্রভু ?

ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।

দিই প্রভু।

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ায় ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েবা বোদে কষ্ট পাইয়াছে, বৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে ! হয়তো কাবও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়তো তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবাব জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের বোদে ভাজা কবিয়া শাস্তি দিয়াছে। আজ বিধবা মেয়েটির রাজা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু রাগ কি সদানন্দের আছে ? শাস্তি কি কাবোকে সে দেয় ? মায়া কি তার হয় ? শুধু তাকে দর্শন করিয়া আর তাব দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিলে !

মেয়েরা ছায়া পাওয়ামাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইল। মেয়েদের মৃদু গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজি এবার কী বলিলে ?

নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই ?

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা। কোথায় শতরঞ্চি জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোপে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণ কজন খেয়াল করিয়াছিল ? বলাই কৃতার্থ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর, অনেক খয়স হইয়াছে শ্রীধরের, যাটের কাছাকাছি। সাতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন-তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ

করিতে সে অদ্বিতীয়, সুতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে সে বামায়ণ মহাভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সবল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়িতে প্রায়ই এ রকম সভা বসে, তবে এত বড়ো নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষি-মজুর তেলি-তাঁতি কামার-কুমোরের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাতজোড় করিয়া শ্রীধর বলিল, চারবাদলা নেমে গেছে আজ্ঞা।

চারবাদলা নামার সঙ্গে বাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কী ? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে জল আসে। চিরদিনের নিয়ম। টিপটিপ কবিয়া দু-চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি-ভাসানো বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মুদু হাসে। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু শ্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকে তিরস্কাব কবিয়া বলে, এ সব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরনের সব কুসংস্কার ? সাধুজির স্নেহমধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যে সব কুসংস্কার তাদের আছে সে সব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষ্টিয়া বাথিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট কবিয়াছে। তারপব শঙ্ক নদীতে হঠাৎ শ্রোত দেখা দিবার কারণ সে ব্যাখ্যা করে। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায় মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, এ কী সহজ আপশোশেব কথা ! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির বহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জলসঞ্চাবের কারণ না জানা : 'নান্দে, এই বৃষ্টি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামানো কেন ? জানার মধ্যে যে যতটুকু জানে তাবই মধ্যে, প্রকৃতির সবটুকু বহস্যের খনি নিহিত থাকে। বাধাই নদীতে জলশ্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলশ্রোত যে আসিয়াছে এটুকু তো জানো ? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান করো, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতেব দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সংকেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মশগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসব জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকেব মনে হয় দুর্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মতো বৃষ্টিয়া ফেলিয়াছে। কী বৃষ্টিয়াছে এ কথা কেউ ভাবে না, বৃষ্টিতে পারিয়াছে এই ধাবণাব উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনেব শীর্ণ স্নান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামি জুটিবে ভালো।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপিচুপি আসবের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরি হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পাব হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজির কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কী ? আবেক দিন সময়মতো আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহ যারা ছুটিয়া আসে তাদের সকলের মনেই তপোবন কমবেশি প্রায় এই রকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত অধীরতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপলা হাবায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড় শান্তি আছে তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনই সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অনন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইঞ্জিরের মৃদুতর উপচারগুলি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজের চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ।

আট বেয়ারার হুমহুম শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঞ্জালে পরিণত করিয়া একটি পাশকি একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটিরের সামনে। আসর

বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটির বেশি তফাতে নয়, একটা বাঁশঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুলগাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল কে আসিয়াছে। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পালকিতে আর যারাই চাপুক, আশ্রমে তারা আসে না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।

এখানে আসতে বলো।

এখানে প্রভু ?

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে নাই, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুবুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে সে আশ্রমে পায়ের খুলা দিয়াছে তাই কি যথেষ্ট নয় ? তার প্রজাদের এই আসরে তাকে ডাকিয়া আনার তো কোনো মানে হয় না ! যার কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, সে শিষ্য হইলেও তাকে একটু, খুব সামান্য একটু, খাতির করিলে দোষ কী ?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না-বুঝার ভান করাই সবচেয়ে সহজ।

হ্যাঁ, বলো গে আমি এখানে আছি।

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কীভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড়ো চালাক, ভাবিয়া-চিন্তিয়া যদি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢেব সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটিরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য নামিয়া গেল তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁয়া প্রণাম করিবার ও প্রণামি দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিল রক্তমাংসের দেবতার মতো। দেবতার মতোই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানহিয়াছে ভালো। নয় তো এই বৃষক্ক বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশিবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপশোশ করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি হৈর্ষের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?

সদানন্দের কুটিরে সদর আর কিছুই নয়, বড়ো একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেন্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের, বাদামি ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোটোবড়ো সমস্ত ঘরই এই ধরনের, উপরের ছাউনি ছাড়া বাকি সব চুনসুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটির।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটোখাটো সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিশের মতো, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দ্বিধাসন্দেহ নিবেদন করা চলে, তেমনই চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা, এমন কী উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়া। শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেয়, নদীর

ধারে আটচালার নীচে এদের সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতাব ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামায় সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চায়। আগ্রহ দেখায় না বটে, দুঃসংবাদে বিচলিতও হয় না, সুসংবাদে খুশিও হয় না, তবু নির্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনে, মুখ ফুটিয়া তো বলে, তাই নাকি অথবা বেশ বেশ।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ও ফলের গাছে বাগানের মতো। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা, জল বড়ো মিষ্টি আর ঠান্ডা। গবর্মের দিনে সূর্য যখন পাতার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেন্ট করা গোলাকাব চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শূণ্য ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভালো। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নীচের জল তো দেখা যায় না, গবর্মের দিনে রাত্রে তাই যোভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠান্ডা সিমেন্টে গা এলাইয়া দিতে সাধ যায়। ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন কবিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে, এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কী সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছে !

উঠানের একদিকে সদর, বাকি তিন দিকেই প্রায় ঘর—কোনো ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোনো ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অস্তঃপুর। অস্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানের তুলনায় আকারে অনেক ছোটো আব আগাগোড়া সিমেন্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শূণ্য ঝকঝকে তকতকে মাজাঘষা পরিচ্ছন্নতা। এককোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অস্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনোদিন নাকি ধরবেও না।

অস্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে। নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোটো একটি দবজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল আটচালার সভায়। এখন মছুরপদে ফিবিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিবিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া বহিল, বাহিরের মাথা-মদপায়া মাতালের মতো ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিভবিড় কবিতা কী যে বলিতে লাগিল, নিজেব কানেই তা গেল না। নিজেব কথা শনিবার স্পৃহাও আব নাই। মনে তার শাস্তি নাই কেন, এত মানুষকে সে শাস্তি বিলাইতেছে ? এত ক্ষোভ কেন তার, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার ? কারও সে ক্ষতি করে নাই, কারও উপরে তার হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয়, ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে সে ভালোই বাসে, এ জগতে বিপিন তার সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে সে বোধ কবে কেন ? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অর্নিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অস্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়ে, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেয়।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলে, কে গা তুমি ? কী করছ এখানে ?

চুপ। আমি কেউ না।

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি—অল্পবয়সি মেয়ে। দক্ষিণের বড়ো ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোটো ঘরখানার রোয়াকে দুটি লঠন জুলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট।

সদানন্দ চাহিয়া দেখে নাই, নতুবা বুঝিতে পারিত, মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কমবয়সি মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমে মেয়েদের বেশভূষাও এ রকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এ রকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আনিয়া হাজির কবে ! গত বৈশাখের মাঝবয়সি স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পালকিতে তবে মহীগড়ের রাজাসাহেব আসে নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপাবে সদানন্দ ভয়ানক বাগ কবায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এ সব ঘটবে না, কোনোদিন নয়। ক-মাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে কবে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এবার সে ছাড়িবে না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া কবিত্তে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

যুব বেশি বিব্রত বোধ না করিলে অস্তঃপুরের উঠানে খাপছাড়া নিঃসঙ্গ তালগাছটার গুঁড়িতে মেয়েটাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সদানন্দের হয়তো মনে হইত, মন্দ মানায় নাই। কবে কে দা-কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত কবিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সবু সবু শিকড়ের ইঞ্জিত, সিমেন্টে বিপিন কবে আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি আর এই আবেষ্টনীর মধ্যে অতিরিক্ত একটি মেয়ে। কিন্তু বাগে সদানন্দ অন্ধকার দেখিতেছিল।

বাগ চাপিয়া কোনোরকমে সে বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো ? আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কী ?

জড়ানো সুবে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের নকঝকে তকতকে সিমেন্ট করা উঠানে হিলতোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

তুমি সাধুজি, না ?

মুখে তীব্র মদের গন্ধ, যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বন্দি আসে। জবাব না পাইয়াও আত্মদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, শোনো, আমি কেউ নয় বললাম না এশুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।

বলিয়া খিলখিল করিয়া মাধবীর কী হাসি ! গলায় জড়ানো হাতেব বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পুন্দের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবি পোশাক পরা একটি যুবক, দুজন ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই নালিশ করিতে লাগিল, সাধুজি আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চলো।

আট বেয়ারার পালকি চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসে নাই। আসিয়াছে রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছে সেই। আনিয়াছে পালকির মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পালকি থামিয়াছে, রাজসাহেব স্বয়ং রানিসাহেবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন এক রকম ফাঁকিই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আব রানিব বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বারবার অনুরোধ দিয়া বলিতেছিল, এ বকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড়ো অন্যায্য হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা কবিয়া দিত, এতটুকু হাজগামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনাও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নাব্যয়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচার অত্যাচারের যে ছাপটুকু পড়ে সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এখন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা এখন বিহুল।

বিপিনের অনুরোধেব জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে, কী করব বলুন, এমন একগুণে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওব জন্যই সব ভেঙে গেল। শেষ মুহূর্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, যাক যাক, কী আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতাকে শাস্ত কবিত্তে বেশ সময় লাগিল না, ছোটো ঘরখানায় চৌকির উপর বিছানো ময়ুর আঁকা মাদুরে সে গুম খাইয়া বসিয়া বহিল। রাজপুত্র নাব্যয়ণ তখন পুরেব ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনোদিন কাহাকেও আশীর্বাদ করে না, বিড়বিড় কবিয়া মুখে একটা আওয়াজ করে মাত্র। আজ তাও কবিল না।

ঘবেব আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিল, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নাব্যয়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণ ভাবটা বড়ো বেশি বকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনোদিনই বিশেষ খাতিব করে না, ভয় ভক্তি করার দরকাবও কোনোদিন বোধ করে নাই। আজ তাব সবটুকু তেজ আব বেপরোয়া ভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন কবিল, বাজাসাহেব আসেননি পুত্র; নারায়ণবাবু একটা নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এনোছেন। মেয়েটির কেউ নেই পিতা।

থাকবাব ব্যবস্থা করে দাও। আব তোমবা যাও বিপিন।

আসনে বসবেন প্রভু ?

যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একটু একা থাকতে দাও।

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে কয়েকটা বেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘব হইতে চলিয়া গেল। ঘন্টা দুই পবে সে যখন আবার ঘরে আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভান করিয়া খাটের উপব গদিব বিছানায় পড়িয়া আছে। গায়ে ঠেলা দিয়াও তাব ঘুম ভাঙাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল খুব ভোরে, ভালো করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে শূইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সবত্রে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মাধবীলতার

শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তা ছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝরাত্রি পর্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুটুলির মতো নারীদেহ চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তা ছাড়া, বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে এ অপমানের জ্বালা আছে, প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটোলোক এই চিন্তার ছেদ দিয়া দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকে, আহা, মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছে দ্যাখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না, শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাটা যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কীভাবে যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত বচনা করিতে লাগিল। মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিল বুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাখাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মতো মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বৃকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতাব ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ এমনিভাবে কৌতুহলী চোখ মেলিয়া মহাপুৰুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সি দৈত্যটির পুতুলখেলাব মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

দুই

। লেখকের মন্তব্য : ভবিষ্য দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইজিতে পরিস্ফুট কবিষা তোলাব পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের অবিক্রম ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভালো। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধাবণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভালো নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধাবণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভালো কী মন্দ এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধাবণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড়ো জোর এইটুকু অনুমান কবিষা লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুৰুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা-অজানা জায়গায় আনাচেকানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যা গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে, কোনো যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। সেইখানে বিপিন তাকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য আকাশে বেশি উঠতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জনা জমা হইয়াছিল, কাছাকাছি ছোটো একটি আবর্তে কয়েকবার পাক খাইয়া একটা মরা কুকুর ভাসিয়া গেল। বড়ো আপশোষ হইতেছিল

সদানন্দের, অনুতাপ মিশ্রিত গ্লানিবোধ। তবু শবীর মন যেন হালকা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতোর ব্যাখ্যা হৃদয় ভাবাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর। ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যায়েব শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনভাবে একসঙ্গে আসে ?

বিপিন পাশে বসিতে বিবস্ত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিপিন বোঝাপড়া কবিত্তে আসে নাই, ভাব কবিত্তে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভালো পাবে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই কবাব কৌশল তাব জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘবে মাপবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিত্তে যায়, তাবপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, বড়ো ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন ? তুই ছাড়া আব কবও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম ? তোব কাছে ছিল বলেই নারাগবাবুরও ভাবনা হয়নি, আমারও ভাবনা হয়নি।

এত বড়ো তোমামোদেও সদানন্দ খুশি হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টেব পায়, দুজনব মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাবব, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ব যখন বিকাশ হইতে থাকে সেই শৈশব হইতে পবস্পরকে তারা ভালোবাসিয়া আব ঘৃণা কবিয়া আসিত্তেছে, এ জন্য। কতবাব ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে কিন্তু এ জগতে নূতন আব একটু বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপস্কন্দ মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খববও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খাবাপ হয় নাই, আবাব যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে—পবস্পববব মধ্যে মশগুল হইয়া, ঘণ্টাব পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আব ঘণ্টাব পর ঘণ্টা চূপ কবিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড় হাত বাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায, একেবাবে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনব এই ভাবপ্রবণতা, তাব ক্রোধে অভিমানেব এতখানি ভেজাল।

তুই যা ভাবছিলি তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভালো, ওকে না জানিয়ে নারাগবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।

নারাগ আব আসবে না।

আসবে,—ও বেলা, নয় তো কাল সকালে। চার-পাঁচটা :র মধ্যে একটা বাবস্থা কবে মাপবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ কটা দিন একটু রয়েসয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোব। আব কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম ? রাজা সাহেবের ছেলে, দুদিন পবে নিজে সব কিছুব মালিক হবে, ওকে তো চটানো যায় না, তুই বল, যায় ?

সদানন্দ গম্ভীবমুখে বলিল, বড়োলোকের পা চাটা আব টাকা বোজগাবের ফন্দি আটবাব ভন্ন কি আশ্রম করেছিলি বিপিন ? তা হলে বাবসা কবলেই ২০ ?

বিপিন তর্ক কবিল না, হাতজোড় কবিয়া হাসিয়া বলিল, এ বাবসা মন্দ কী প্রভু ?

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, তামাশা বাখ, ভাঙেঃ নাগে না। দিন দিন তুই যে কী ব্যাপার কবে তুলছিস বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল সব চুলোয় গেছে, তোব খালি টাকা টাকা টাকা ! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবাব কেন ? এবাব আসল কাজে মন দে না ভাই—এ সব ছেড়ে দে। আব টাকাই যদি তোব বড়ো হয়, তুই থাক তোব আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শাস্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবাব সক্রুণ ভঞ্জিতে বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্মান্ত হওয়ার ভঞ্জিতে বলিতে লাগিল, টাকা ? টাকা দিয়ে আমি কবব কী ? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা বোজগাবের

ফন্দি আঁটি ? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আমবাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার ? এবার যদি নারাগবাবু কিনে দান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কীসে কী হয় জানিস না। বড়ো কাজ করতে চাইলেই কি করা যায় ? কবতে জানা চাই। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি হত ? রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনত না। ভালো উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং এ সবে দোষ হয় না। নারাগবাবু একটা মেয়েকে বাব করে এনেছে তো আমাদের কী ? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বার করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি। এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস না, তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

বিপিনের এত বড়ো বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিল, আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।

ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মতো ঘুমোস সারাবাত। তোব মতো শয়ে বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।—বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দ ভিতরে গেল। ছোটো ঘরের চৌকিতে সেই ময়ূর আঁকা মাদুরে মাধবীলতা চূপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিল যার কোনো মানে হয় না।

এখানে একা বসে আছ ?

একটু ইতস্তত করিয়া চৌকিতেই একপাশে বসিল। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও স্নান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল নম্র কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুলগুলি যেন হইয়া যায় পাখির পালকের চেয়ে কোমল।

খাবার খাওনি কেন ?

খিদে পায়নি।

কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু ?

মাধবী মাথা নাড়িল।

তা হলে খেয়ে নাও কিছু। চা-টা বোধ হয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব ?

না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।

মাধবীলতা যেন একটু বিশ্বয়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে। সদানন্দের মনে হয়, তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশি মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়া সে তাকে ভর্তসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মতো বসিয়া রহিল। মাধবীলতাকে তার কী বলার আছে ? ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

এমন কাজ কেন করলে মাধবী, কেন বাড়ি ছেড়ে এলে ? দুদিন পরে নারাগ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে কী করবে তখন তুমি ? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলেছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষি করে !

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার দু-চোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভালো করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনও ভেজা। ভেজা চুলের

জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গবম হইয়া যায় মাধবীলতার যে প্রথমে সে খাবাবের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দকে ছুঁড়িয়া মারে, তারপর বাধিনির মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তারপর সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

এই ধরনের কাণ্ড সদানন্দ আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছে, একযুগেরও বেশি আগে আরেকজনকে এমনভাবে শাস্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখে পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিত মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাবাবের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিতও না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে সে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কী। হাত বাড়াইয়া র্যাক হইতে একটি গেরুয়া কাপড় টানিয়া আনিয়া মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক খানিক মুছিয়া ফেলিল। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখির পালকের মতো কোমল আঙুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু ও ধরনের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতা পিঠে একখানা হাত রাখিয়া সে তাকে কাঁদিতে দিল। কাঁচা বক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডের পর ওকে কাঁদিতে না দিলে চলিবে কেন ?

কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আবও জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ-মাব আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, বাপ-মা তার আছে কিনা তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারে, তারই মতো একজনব আশ্রয় ছাড়িয়া মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদবে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতা জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কাবও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক ? এতটুকু মেয়ে, কুমাবী মেয়ে, সে প্রেমের কী জানে, প্রেমিকের দাম তাব কাছে কতটুকু ? খেলার সাথি হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধোই সে অভাবের পূরণ হয়।

মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভালো করিয়া চোখ মুছিবাব পর তাব মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে খেপিয়া গিয়াছিল !

আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চলো তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিল, আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেহ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্তি।

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে সদানন্দ তাকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির পথেই বাহির হইল। বিপিন বোধ হয় সদবেব দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবাব ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন কবিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভালো। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু-তিনটি আঁকারীকা সব পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোনো পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুশি হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া হাঁটিতে যেন আরাম পাইতেছে। বলা মাত্র সে যে তাব সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজি হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য ঠেকে নাই। এখন তার ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজি হইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভালো।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা সাধনভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশি আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তারা ধ্যানধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত টেব পায় না এমন আশ্চর্য্য। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুশি হইবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এ রকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধভক্ত বাস করে, অন্য সকলের তুলনায় এদের ভক্তিব বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমতো বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছে এই রকম, কী যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসি-ভাইঝির সম্পর্কের মতো। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শূক্ষ শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত বৃক্ষ মেজাজ। বউরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধা হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বউদেব পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে বউ নাতি নাতনিতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেবা বাঁধিয়াছে।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল ফরসা রসালো চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেই রকম একটা সকাতব লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্ক মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহাব কলে একই খাদ্য, পরিমাণটা পর্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

বয়স্ক মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেয়, গোলমাল করে কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলে, মরণ তোমার ! আমি অম্বুলে বুগি, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পান্না দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শূনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল দিকি ঢক কবে।

অপরজন মিনতি কবিয়া বলে, বমি হয়ে যাবে পিসিমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি কবে ফেলব।

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পবে একটা খোঁচাও খাইতে হত,—কই লো বত্নী, বমি হয়ে যাবে? বাঁচতে সাধ না থাকে বিশ্ব খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।

এব নাম রত্নাবলী। পিসিমা কখনও ডাকে রত্নী, কখনও বলে রতন। পিসিমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এ জগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই,—একজন ছিল, মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিত, মস্ত সংসাবটা গড়িয়া দিয়া অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছে, উমা যে সংসার ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে, ছেলে বউ নাতি নাতনিতে ভরা বিরাট সংসাব।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিল। বলিল মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।

রত্নাবলী খুশি হইয়া উঠিল, উমা সন্দিক্ত দৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিল। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সি একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে যোগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেবুদগু সিধা করিয়া দেবতার মতো সদানন্দ বসিয়াছে, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর স্থির বিকারহীন একস্থপ মূর্তিমান শক্তির মতো—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিল, তুমি কী ভাবছ উমা ?

আর কী ভাবছ উমা, ধুলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মতো উমা চুরমার হইয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, মুমূর্ষু জন্তুর মতো জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর

করিয়া কাঁপে। গুবুদেবের সম্বন্ধে অনায়াস কথা মনে আসিয়াছে, গুবুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এ কী আকস্মিক সর্বনাশের সূচনা !

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আবও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিষ্ময়ে একবার ভুলুষ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সি নারীকে পায়ে নীচে লুটাইয়া দিতে পারে, মাধবীলতার তা জানা ছিল না। তার নিজের বুকের মধ্যেও টিপটিপ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাধ হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিল, উঠে বোসো উমা।

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনই মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে বলিল, মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মতো, ধুলোবালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে সব সর্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জনায় ভরে উঠে, মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উমা মাথা নিচু করিয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্মমতাব এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সঙ্কতব করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া সদানন্দের কথা শুনিতোছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল, মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা করো। বোসো তোমরা,—আর সকলে কোথায় ?

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটিবের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুবুদেবের ডাক বড়ো।

তিন

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে কিছু হইচই হইল না। বাজপুত্র নাবায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তাব নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীবুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুবি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোব বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথার লক্ষণ টেব পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতি পবিবর্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার বক্তমাংসেব ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুব মুখে ফিবিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডেব রং,—তাদের কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নাবায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দবকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়তো সাহস পাইল না, হয়তো ভাবিয়া দেখিল গোলমাল কবা মিছে, অথবা হয়তো ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তার কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নয়। এসো বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে সে বসাইল কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিঁছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিত না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্যাদা সুদে-আসলে দিবার জন্যই নির্বিকার ভাবটা

বিসর্জন দিয়া জানাইল গভীর স্নেহ। বলিল, হ্যাঁ যাও, বেড়িয়ে এসো গে একটু নদীৰ ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শিগগির ফিরো—সন্ধ্যার আগে।

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিত, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো বাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশি রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে নির্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভালো মনে করিল। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়,—বোঝাপড়া হইবে না, এ রকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল-তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাশ্বরেও মনে না জাগে কারও : মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারও কর্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয়তো একটু ঠান্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে আমি কী করব বিপিন ?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বইকী ! বর্ষাব গোড়ায় এ কী অপবাহু আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সংবরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কী দিন জুটিত না অকালে ক্লাস্ত সূর্যেব। মছুর গতিতে নদীতীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কী বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, সুরে, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর ? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের ? যদি সে তুলনা করে এই বিবাট দেহ শ্রীহীন দরিদ্র শ্রৌচের সঙ্গে বৃপবান ধনবান সঞ্জী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কী হইবে ধার্মিকের মুখোশ পরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস কবিয়া, তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধবিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢেব ভালো, যা হোক তা হোক ফলাফল ? সকাতেব ক্রিষ্ট উৎসুকোব সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করে, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলে, আমি কী, স্ত্রী ?—অভ্যন্ত আত্মাদব যেন দীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পূণ্যবানের মতো অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলে—পাপী। তেজস্বী কম নয় সদানন্দ। গোঁয়ার নয় বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা সে নরম,—খুঁটিনাটিতে যে সর্বদা হাব মানে মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল সে কথা মনে কবিয়া রাখে কে ? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতাৰ এক অপবৃপ মাধুর্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপশোশ বড়ো দুরন্ত। আহা, কী মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিন্মা করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে, প্রায় সমস্ত বাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমতো আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত, সেই বীভৎস কবণ পাশবিক মায়ার স্বাদ ! অনাস্বাদিতপূর্ব সেই মাধুর্যের লোভেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্যহীন ক্রেদান্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়ে মহাতেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকে। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুশি হইবার ক্ষমতাও থাকে না এমনই নিস্তেজ আর ভৌতা হইয়া পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্তত সদানন্দ যে রকম ভাবিয়াছিল, সে রকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মতো

প্রথমটা একেবারে খেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠান্ডা হইয়া গেল। ফাটো ফাটো বোমার মতো অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবি করিল, এর মানে?—সদানন্দ জবাব দেওয়া মাত্র বোমার মতো ফাটিয়া গেল। বাস্! আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নাবায়ণ যেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই জিজ্ঞাসা করিল, মাধবী নারায়ণবাবুকে কী বলেছে?

আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলে কয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি কী কবে বলব?

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, তোব পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে? বাবা বলে ডাকে না তোকে?

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তাব নিছক সন্দেহমূলক কদর্য পবিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিল না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিল, পাতানো মেয়ে আবার কীসেব!

ভিতরটা রিরি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয়-পবাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশি ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখেব হান্টিটা খেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় কবিত্তে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চূপচাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খাবাপ। হঠাৎ হুঁ বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাশা কবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কিনা।

সদানন্দ ধৈর্য হারাইয়া বলিল, কী ভাবছিস শুন!

কিছুই ভাবছি না।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিলে কিনা ঠিক করিতে পারিতেছিল না; সংকোচটা কীসের তাও সে নিজেই ভালো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কীসে যেন বাধিতেছে— একটা অর্থহীন অকাবণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল, মাধবীকে ফিবিয়া রেখে আসি তবে কাল পবশু?

কোথায়?

যেখান থেকে এসেছে, ওর মামাব বাড়ি।

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিল, না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।

ছোটো একটা নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাডাচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, কেন মিছে বালিব ঘব বাধছ বাবা! রাজপুত্রকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে তেমন মেয়েই ও নয়। গুবু সেজে বড়ো জোর গায়ে মাথায হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পাব, তাব বেশি কিছু—

তোব কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন?

বিপিন ধৈর্যহারী হইয়া বলিল, মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোব। কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস! ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত, বৃকে করে?

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন গটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানি হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে

থাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সম্ভব হইবে ? এ কথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে সে তা কল্পনাও করে নাই।

শেষ পর্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব তাও ভাবতে পেরেছিল সদা ? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।

মুখচোখের কী ভঙ্গি বিপিনের, সর্বাঙ্গে কী থরথর কম্পন ! দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কী যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিল। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন ?

বিপিন বলিল, হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়।

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল ? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া ? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ কবিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানে, সে তবে কেমন কথা হয় ? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন ! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকে, যথার্থীতি নিজের কাজ করিয়া যায়। নিয়ম-কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোনো ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণী বিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক কবিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না কবিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসাভাসা জবাব দেয়, আসবে, দু-চারদিনের মধ্যে আসবে।

দু-তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন কবিতো থাকে। অনেক রকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে বিচুড়িতা তৈরি হইয়াছিল সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতোই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য। কতবার তো ছাড়াছাড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এ রকম মন খারাপ হইয়াছে কবে ? তবে এ ভাবে ছাড়াছাড়ি হয় নাই কোনোবাব। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ কবিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে ? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নতুন নতুন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আব বলিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাইবে ! এমন কী ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল ?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোনো দিক দিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজি হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই যেন কাজটা বিপিনের

প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এ ভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা কবিত্তেছিল ? ভালো লাগিত্তেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুব জীবন ? এ ধরনের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলে। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতার কথা তার চেয়ে কে ভালো কবিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিত্তেছে তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবাব আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পবিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচাব কবিয়া নিজেব অবস্থাত্তা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিত্তে পারে। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া তার চলিবে না।

বুঝিত্তে পরিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় সে মাটিতে লুটাইয়া দিত্তে পারে, শতাধিক মানুষ পাহির হইতে সম্ভবে তিন দিন তার উপদেশ ঠাঁ করিয়া শুনিয়া যায়, দেশের চাবিদিকে নিকটে ও দূরে জানা-অজানা কত ভক্ত তার ছড়াইয়া বহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তাব চলিবে না ? এ তো ভালো কথা নয়।

আশ্রম পবিদর্শন ও পবিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজেব হাতে গ্রহণ কবিবার চেষ্টা কবে। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়াই বুকটা ছ্যাত কবিয়া ওঠে—
কৃষ্ণ। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দেশ দিত্তে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিত্তে, আশ্রমের কাজ ও জিনিসপত্রের হিসাব বাখিত্তে, নদীর ধারে কাঠের গুড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিত্তে, এমন কী রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিত্তে পর্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খাবাপ হইয়া যায়—যাক। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, তাকে ছাড়া তার চলিবে না, সেও তেমনই আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি কবিয়া দেখাইয়া দিবে বিপিনকে ছাড়াও তার চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে টেব পাইল, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালানোর কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনই জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আব সেটা কার্যে পরিণত কবা আলাদা কথা—এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টেব পাইতে লাগিল। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইল না, নিবুৎসাহও হইল না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, জানা চাই কী হইলে কী হয়, কী করিতে কী করা দরকার। এক হিসাবে ভালো হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওয়াতে। বিপিনের উপব বড়ো বেশি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, বড়ো বেশি দূরে সরিয়া যাইতেছিল আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার সব বুঝিয়া মনের মতো করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবে, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিত্তে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ-বারোদিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উলটাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে সে একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভাবাচাফা খাইয়া গিয়াছে, টেব পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয় নাই। সাজিয়া চলিতে গেলে এ সব যে অবশ্যস্বাবী সে তা জানে। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়তো এতদিনকার কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্যন্ত, কে বলিতে পারে ! অন্তত কড়া বিধিনিষেধগুলি যে

শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভালো করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙন ভালোরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনই।

সদানন্দ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাঁচলাম ভাই। বলা নেই কওয়া নেই কোথা গিয়েছিলি তুই ? আশ্রম চালানো কী আমার কাজ !

বাহাদুরি করতে তোকে কে বলেছিল ? যা আরম্ভ করেছিলি তুই—চমৎকার !

কথাটার খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্যসত্যই বাহাদুরি কবিয়া বলে, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিল, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিল।

কোথায় গিয়াছিল বিপিন ? আমবাগানটা বাগাইতে—একেবাবে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন ? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক ! কী গবজ বিপিনের খবর দিবার ! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে। হঠাৎ সে জন্মেব মতো বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কী কবে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেকদিনেব।

চার

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসব পায় বেশি। বড়ো চালাটার নীচে সর্বসাধাবণের জন্য সভা বসে মাঝেমাঝে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোক কী তার কথা শুনিতো আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানোব জন্য ? একটু কষ্ট স্বীকার করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয় ? কিন্তু আশ্রমের ভাঙারে দান হিসাবে প্রণামি তো তাকে প্রায় সকলেই দেয়, কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বইকী। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের ? পুণ্যও কি বাজারের ভালো মাছ তরকারির শামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙিয়া জোঁগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয় ? সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তাঁর আকর্ষণকে জোঁলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড়ো আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটিরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পূজার্চনা যার যত খুশি করে, যার যত খুশি করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসে কম। কোনোদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনোদিন থাকে মুঘলধাবে বর্ষণ। সদানন্দ হয়তো মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীবাধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসে, হয়তো বাহির হইয়া যায় কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়তো নিজেব ঘরে শূইয়া বসিয়া পড়ে বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যায় খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিল তোলা জুতা খটখট করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়মবিবুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি দিয়াছে, নিয়ম-অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চূপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদানন্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বৃকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলিয়ায় মাধবীলতা যেভাবে বসিয়াছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনিভাবেই, তেমনই মনোযোগের সঙ্গে শুনিতোছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড়ো কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোনো কিছুর রূপ ধরিয়া দু-চোখে ফোয়ারার মতো উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শূণ্য অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টসটস করিতেছে জীবনীশক্তি রসে। আব ঠ্যা, চোখ দিয়াও টসটস করিয়া জল পড়িতেছে বটে মেয়েটার।

মাধবী বলছিল এখানে থাকতে ওর ভালো লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খাবাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

তাই নাকি ! বলিয়া বিপিন এমন একটা আপশোশের শব্দ করিল যে ঘরের বসুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মতো গর্জিয়া উঠিল। কী বলিল ? বলিয়া সদানন্দ যে গর্জন করিয়া উঠিল সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন হুঁগকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘব হইতে চলিয়া গিয়া আবেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময় মতোই নীববতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, অন্যকথা ভাবছিলাম।

সদানন্দ বলল, ও ।

এখানে থাকতে তোমার ভালো লাগছে না মাধবী ?

লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড়ো খাবাপ হয়ে যায়।

কেন ? মাঝে মাঝে মন খাবাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর ? বাড়ির জন্য ? না, বাড়িতে এমন কে আছে মাধবীর যার জন্য মন কাঁদবে ! তবে ? মাধবী শূণ্য মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শূণ্য বলে, জানি না। বাহিবে আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ওই বকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুপি কবিয়া আনা একটি যুবতি মেয়ের মন খাবাপ হয় কেন, প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কী সহজ ব্যাপার ! অন্য কোথাও যাইতে চায় মাধবী ? না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছে, এবার বিপিন ঘামিতে আবস্ত করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে কবে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলই ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোটো একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, ভগনাল দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্ববে বলে, আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেই জন্য খাবাপ লাগছে। কদিন বাহিবে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভালো লাগত। নাবাণবাবু আমায় নেমস্তম্ব করেছেন পবশু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে ৬ বেশ জায়গাটা।

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, না।

বিপিনকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যায়, রাজপুত্র নাবাযণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না এ জন্য বিপিনের খুশি হওয়ার কারণটা তাঁর বোধগম্য হয় না।

চলো একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধাব থেকে। বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, আমরা যাই প্রভু ?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে বলে, যাও।

সেই দিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কী ভাব মাধবীলতার ! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, দুজনের মধ্যে কী যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন এক নতুন ধরনের আত্মীয়তা।

বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও টিল পড়ে না। আমবাগানে গাছ কাটিয়া কুটির তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায় তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটির তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটোখাটো কাজ কবিয়া সময় কাটাইতে পারে তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা। মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মতো চুপ করিয়া বসিয়া তার কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টসটস কবিত্তে থাকে জীবনীশক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া অন্য কিছু আজকাল আর টসটস করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সম্পূর্ণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না ?

বেশ লোক উনি। আমায় খুব ম্লেহ করেন।

আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভালো লাগছে ?

তা লাগছে। ভালো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কী ব্যবস্থা কবে দিয়েছেন ?

এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজকর্ম করতে পাই, ঘুরে কেডাতে পাই—

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গভীর মুখে শুনিয়া যায়। একটা দিক ধীরে ধীরে তার কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তার কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্বদা চোখে রাখিয়া কী ভয়ানক আদর-যত্নটাই দুজনে যে করিয়াছিল তাকে। সে যেন শিশু, সে যেন ভগ্নুর, সে যেন দুস্ত্রাপা কিছু, সেবায় ম্লেহে খাতিবে শাসনে মাথায় করিয়া তাকে ম্ল বাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। এক রকম কিছুই কবে নাই বিপিন, উমা আব রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন কবিত্তে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের একপ্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়াব সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটিরের যতটা দুধ যাওয়াব কথা বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারি কুটিয়া দিয়া সাহায্য করিবে, আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারি পথ্য। এমনই সব ছোটো ছোটো কয়েকটা কাজ।

আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভালো বুঝতে পারিনি, বিপিনবাবু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কী বলেছেন বিপিনবাবু ?

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিক্ভভাবে বলিল, কীভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায় মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। জীবন, ধর্ম, সমাজ, দেশ এই সবের জন্য বড়ো বড়ো কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

এ ভাবে বলছেন যে ? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের ?

আহা, চোখ দুটি ছলছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টসটস করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের

মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মতো ছাঁতছাঁত করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভান করিতেছে। বোকামির ভান, সরল বিশ্বাসের ভান, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিনি আছে, সেও তাদেরই একজন,—

অথবা তার নিজেরই ভুল ? যেটা মাধবীর ভান মনে হইতেছে মাধবী আসলে তাই, সে নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে, আরেক দিন তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্বোধ জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। সে চিত হইয়া শূইয়া পড়ে। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে, সেই করিয়া দিয়াছিল তার আশ্রমবাসের ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার সদানন্দ বলিয়াছে মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন দু-কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

পা টিপে দেব ?

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ওৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়োসড়ো হইয়া সে বসে। প্রথমে এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শূইয়াছিল, লজ্জায় সংকোচে যেন তেমনই কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ত দেওয়ার মতো ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবায় নেন না, বড়ো কষ্ট হয় আপনাব।

না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে। তুমি এবার যাও মাধবী।

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কী করিয়া দিয়াছে বিপিন : নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কী সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তার আর মাধবীর মধ্যে ? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবাব সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমের জীবন নাকি তাব হালকা হাসিখুশিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সময় সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে যেন তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কী ? আর কী উথলাইয়া পড়ে তার সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে ? পবিগত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ ? কিন্তু সেটা কেমন হয় ! সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে, এমন দুর্বোধ ও রহস্যময় প্রণালীতে ? সর্বদা যেন আত্মসচেতন মাধবী, সর্বদা সংযত—গভীর দীনভাবে সর্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি নামি করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়া ছিল। হযতো শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে ? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হযতো মাধবী কুটিরের মেঝে ঝাট দিতেছে—শাড়ি-শেমিজ এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলো। ডাক পৌছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল মানিক ৩য়-২০

খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি—ঠকঠক শব্দ স্পষ্ট কানে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়িটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দু-হাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষবারের মতো উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন ?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেল। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছু দূরে ছোটো ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাই তো বটে, বিশ-বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর বাঁট দিতে দেখিয়াছিল বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কী মানে আছে !

সদানন্দকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভবিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া করিল প্রণাম। নীরবে নির্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুক। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঁচ হইয়া রহিল। এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানে। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হাতেব বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী ?

মাধবী অশ্রুটস্ববে বলিল, না।

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিল, এ ছাড়া স্নেহ-মমতা জানানোব শাবীরিক প্রক্রিয়া আর কী আছে। একটু আদব কবিয়া বুক হইতে নামাইয়া দিল—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি ?

মাধবী পুনর্জীবিতার মতো অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—

রাগিনি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমার সেবা করতে চাও—কী সেবা করবে বলো তো ? আপনি যা বলবেন।

পাকা চুল তুলে দেবে ?

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালকের মতো আজও নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিত দৃষ্টিতে বিকলের মতো সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কী তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার-বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মতো, অমর সংস্কারের মতো, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কী সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপপুণ্য যাচাইয়ের একটি করিয়া কপ্তিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপপুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন—? নয়তো মাধবীকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তার কেন মনে হইতেছে নিজে সে মুক্তি পাইয়াছে—একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে ?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমেব সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেল না। পরদিন আশ্রমেব সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুরেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপ্ত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

তুই আমার সর্বনাশ করবি বিপিন।

মাঝে মাঝে তোর পাগলামি দেখে—

পাঁচ

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরি, যার ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারি জেলে, যার দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্মশুরবাড়ি নামক নকল সামাজিক জেলে, যাব উপর রাজা সাহেবেব ভয়ানক বাগ, আশ্রমে যে একেবারেই আমল পায় না, সুখোগ পাইলেই সকলের সামনে যাকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা সে একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় বলিয়াই অবশ্য তার উপর রাজা সাহেবেব এত রাগ, আশ্রমে তাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরিৰ জীবনযাপনেব একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধৰিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। কীভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা কবিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে, মনে মনে মহেশ চৌধুরি সকলের মঙ্গল কামনা করে, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয় নিশ্চিত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার—দৈনন্দিন জীবনের কাব্বাবে মানুষেব সঙ্গে মানুষেব যে অসংখ্য দেওয়া নেওয়া চলে তার মধ্যে মহেশ চৌধুরিৰ কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঞ্জেব সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য : কোনো মানুষ সম্বন্ধে জনসাধাবণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণাব সমষ্টি কিন্তু ধারণাগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বেব দুটি-একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষেব কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজেব ধারণা কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজেব মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে তার মধ্যে কোনো একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বেব বিকাশে পবধর্মানুশীলনের প্রয়োজন, এই জনা জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহও বটে ! যার ব্যক্তিত্বেব প্রভাব যত বেশি, তাকে বেশি পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বেব প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, সে ছোটো আমি বড়ো, তার যা কিছু আছে কম আমার সে সব আছে অনেক বেশি। সূত্রাং পরের ছোটোবড়ো কমবেশির সংস্কার ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র। এ পর্যন্ত মোটকথা, কোনো জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বেব সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশালাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এ সব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরির ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা এদের ব্যক্তিত্বের যেসব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরি ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোনোরকমেই দেখানো যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরির মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলত তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।]

মহেশ চৌধুরি প্রত্যেক দিন আশ্রমে যাতায়াত করে, সাধারণত বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তার আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে সে ঘুমায় কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয় একরকম শেষরাত্রে। লাঠি হাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হয় আশ্রমে, আবছা আলো-অন্ধকারে এদিকে খোঁজে ওদিকে খোঁজে, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছে লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথিটি তার কুটিরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা-ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যায় নদীৰ ধারে। কোনোদিন হয়তো সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলে তো বলে, নতুবা মহেশ চৌধুরির মুখ খোলে না।

কে, মহেশ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড়ো জালা প্রভু মনে, বড়ো কষ্ট পেয়েছি সমস্ত বাত। তাই ভাললাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করবে—

সদানন্দের ধারণা জালা তারও আছে। সে বলে, তোমায় না আশ্রমে আসতে বাবণ কবে দিয়েছি ?

না এসে পারি না প্রভু।

বটে ? বেশ, বেশ। তোমার মতো আর দু-একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে-জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কী বল তো শূনি ?

চরণে ঠাই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।

পাগল ? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরির ? এ রকম অন্ধভক্ত সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা কেউ নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরি কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা এ সবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড়ো রাগ হয় সদানন্দের—বড়ো আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ সে কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তার দাবি মেটায়। তারই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তার। কিন্তু মহেশ চৌধুরি কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটি মাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে—তুমি আমায় চাও বা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের যে আদর্শ সে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে নিজের জন্য,

সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্তহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এ বিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নীচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরির দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারির মতো মহেশ চৌধুরি দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মতো তাকায়, স্তব করার মতো কথা বলে—তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তার আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তার সমালোচনাও করে কমবেশি, তাদের ভুলাইতে কোনোদিন তার কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মতো তারা উদগ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তার নাই। মহেশ চৌধুরির পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামির পুরস্কারকে করিয়া ভুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ ?

আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে।

আঁা ? সে কী কথা—ছাড়া পাবে বইকী, দুদিন পবেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা, একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া, হিসাব কবিলে যার দাম কানাকড়িও হয় না কিন্তু মহেশ চৌধুরির কাছে যা অমূল্য ?

কোনোদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, মহেশ চৌধুরি ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাকে দেখে তারপর আবার আপন মনে তপোবানে ঘুরিয়া বেড়ায় আর সদানন্দের নন্দু... পড়ে না। এখানে সে অনাহুত অবাক্তিত আগতুক, বিপিনেব শাসনে আশ্রমের কেউ তাব সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমতো অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মতো সে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগবণ লক্ষ কবে।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরি পাইল সাতুনার শ্রীধরের বাড়িতে। বাগবাদায় নিজেব বাড়ি হইতে আশ্রমে যাওয়ার পথে শ্রীধরের বাড়ি পড়ে, মহেশ চৌধুরি এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যায়। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড়ো ঘবটাব দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহুে যাইবে ভাবিয়াছিল সদানন্দ সাত দিন দর্শন দিবে না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিবাছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামবুপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকি অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরি বলিল, কেউ দর্শন পাবে না ?

শ্রীধর বলিল, বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরি মশাই। প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।

প্রভুর জন্য তোমরা সর্বস্ব ত্যাগ কবতে পার না, জীবন বিসর্জন দিতে পার না শ্রীধর ?

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরি কালের মুখের দিকে চাহিতে থাকে, সকলে অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

আমি প্রভুর চরণ দর্শন করতে যাব শ্রীধর।

সকলে স্তব্ব হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরির অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচখচ করিয়া বিধিতে থাকে, কঠিন একটা

সমস্যা। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এত বড়ো ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরি হয়, সদানন্দ তাকে আমল দেয় না কেন, কেন তাকে শিষ্য করে না ? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা মহেশ চৌধুরি কি আসলে তবে ভালো নয়, তার নীতি ধর্ম ভক্তি নিষ্ঠা সব লোক দেখানো ভালোমানুষি ?

মহেশ চৌধুরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে।

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে সে তাদের ফিরাইয়া দেয়, বলে, না, আজ আব তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভালো।

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরি যাকে সামনে পাইল তাকেই প্রভুব চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিল। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরি গিয়া ধরিল বিপিনকে।

বিপিন বলিল, সাতদিন পরে আসবেন।

মহেশ চৌধুরি মিনতি করিয়া বলিল, আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুব জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।

বিপিন রাগিয়া বলিল, কে আপনাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সোধেছে মশায় ? কেন আসেন আপনি আশ্রমে ? যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ফিবিয়া আসিল শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদবের কুটিবের সামনে কদম গাছটাব তলায় বসিয়া পড়িল। কুটিবের আড়াল হইতে সূর্য উঠিলেন মাথাব উপবে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটিবেব আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িল না। রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কী তপস্যা করিতে বসিয়াছে গাছতলায় ? এত জায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন ? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় বিশ্বয় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে,—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন-চারবার মহেশ চৌধুরির বাড়ি হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর গোমস্তা, বর্ষণের পর আসিল মহেশের ভাগনে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে ভেজা মূর্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কী ! কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকালবেলা হাজির হইল একেবারে মামিকে সঙ্গ করিয়া।

ভাগনে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না ? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্যানতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে ? কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিল। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরি কাতরভাবে বলিল, শোনো শোনো, আহা এমন করছ কেন ? বাড়ি ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।

খোলা জায়গার ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরি হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলোভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হালকাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য, অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড়ো করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষবেলার আলোয় দাঁত করে ঝকঝক, চোখ কবে চকচক। আশ্রমে দাঁতমাজার নিয়ম বড়ো কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করে, মেয়েদের দাঁত তাই সতাই ঝকঝক করে—কারও কম কারও বেশি। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর আব বেশি ঝকঝকে, চোখও তার বড়ো আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দু-হাতে পুঁটলি করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটামাত্র আঁচলসমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গ খরখর কবিয়া কাঁপে। কী কুৎসিত যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ডেউ তোলা কাঁপনি। শশধর অভিভূত হইয়া চাহিয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরির স্ত্রীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ কবে না, আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলে, আপনি যাননি এখনও ?

মহেশ চৌধুরি বলে, আঞ্জে না। আপনাকে তো বলেছি, একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।

তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

তাই থাকব।

বিপিন একটু হাসিল, আপনার ভক্তিতা কিন্তু বড়ো খাপছাড়া চৌধুরি মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধবে না, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।

মহেশ চৌধুরি নিশ্চিতভাবে বলিলেন, ও আদেশ আমার জন্য নয়।

মাধবীলতা বলিল, না, সত্যি উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি এক মনে সাধনা কবেন কিনা।

আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।

তা কী হয় ?

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরি গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া বহিল। নিরীহ, শান্ত, ভীৰু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত। তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর বত্সাবলী কোনোবাকমে তাব স্ত্রীকে একটু দুখ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহাৰ্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না,—দুধ, ছানা, মিষ্টি ফলমূল এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা-মামির কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত আশ্রমের দু-একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটিরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারোটাব কাছাকাছি গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি মাথায় বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কান সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কন্ফার্টার জড়াইয়াছে, ঠান্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি। মহেশ চৌধুরি স্ত্রীকে বলিলেন, যাও না, দাওয়ায়, যাও না তোমরা ? বিস্তিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি ! যাও, দাওয়ায় যাও।

বিভূতির মা বলিল, আর তুমি ?

এককথা একশোবার কেন বলছ ? বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে ? তুমি এখানে বসে থেকে কী করবে, তাতে লাভটা কী হবে শুনি ?

তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, অনেক রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরি আর কিছু বলিল না, কেবল শশধরকে হুকুম দিল দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতে গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপশোশ করিয়া বলিল, বর্ষাকালে এ কী ঠান্ডা মশায়, অ্যা ? এ কি শালার শীতকাল নাকি ?

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল, বউটা এসেছে কাল—ছ-মাস বাপের বাড়ি ছিল। কী গরমটা গেছে কাল রাতে, তা বউ বলে কী, না বাবু, বাদলার দিন ঠান্ডা লাগবে। বলে—

আপনি বাড়ি ফিরে যান না ?

শশধর উঠিয়া বসিল। —আমি ? আমি কাল বাড়ি ফিরেই কী করবে জানেন ? কানটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ি থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি, বউটাকে সুদ্ধ। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু, কাপড়চোপড় যা হোক ?

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদল রাতে সদানন্দের সদর-দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারির ছিল না। বিভূতির মা ডাকিয়া বলিল, ও শশী, ও ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস কর আরও যদি ছাতি থাকে একটা—

একটা কেন, আরও তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তাব মাথার মধ্যে তখন কিম্বিকিম্বি কবিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে আব চিৎকার করিয়া কাঁদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল। একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামির-হাতে, আর একটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরিকে দিতে গেলে সে বলিল, না, আমার ছাতি চাই না।

স্ত্রী বলিল, কেন ? এখানে ধর্মে দিয়েছ, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কী ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, নিজে থেকে আমি কিছুই করব না।

তখন মহেশ চৌধুরির স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আপশোশ আরম্ভ করিল যে মনে হইল আবার বৃষ্টি আজ অপরাহ্নের মতো বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু খানিক আপশোশ করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিল, বলিল, যা তুই, দাওয়ায় শো গে যা শশী।

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, আমিও বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা বাদ যাব কেন।

তারপর মিনিট দুই সব চূপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শৌ শৌ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল বরিবার ক্ষীণ জোলো জোলো আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে এবং সেগুলি স্মৃতিও নয়।

সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমরা সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরি করা চাই, হাঙ্গামা বাধানো চাই। যদি শাস্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধমা দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কী তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায় ? স্বামীভক্তি

দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায় এসে ভেজা চাই। কী অদ্ভুত সতী রে আমার ! স্বামীর শাস্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো !

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরির রাগ আব জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভর্ৎসনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিত, বলিতে পারিত আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছু না বলিয়া একেবারে চূপ হইয়া গেল। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটিরের কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে ! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই এমন শাস্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে ? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটিরের যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালাপোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মতো দু-চোখ ভারী হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে ? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই বটে। কোনো দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল না বলিয়া নয়, মনের আগুন রাত্রি জাগরণের অবসাদে চাপা দিবার দরকার হইয়াছিল বলিয়া নয়। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরি মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করে। হে মহেশ চৌধুরির জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরির কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরির মন যেদিন নির্মল হইবে সেই দিন নায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরির সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শাস্তি দিবে, এ কথা জানিতে কী বাকি আছে মহেশ চৌধুরির। এই ধৈর্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়াও শিষ্যের মতোই তাকে যে প্রকাবাস্তুরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মহেশ চৌধুরি জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা করো। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু, মহেশ চৌধুরিকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরির সাধনা ব্যর্থ করার জন্য একজন কী অন্যায় আবদার আরম্ভ করিয়াছে। বাতদুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে ? স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মতো মনের জোর যে মহেশ চৌধুরির নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল। আজ বেশ ঠান্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরির কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায়—ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি ?

পরদিন চারিদিকে খবর ছড়াইয়া গেল মহেশ চৌধুরি সস্ত্রীক সাধুবাবার আশ্রমে ধনা দিয়াছে। চারিদিক হইতে নরনারী দেখিবার জন্য আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল—সদানন্দের আশ্রমে আসিয়া তারা আজ মহেশ চৌধুরির দর্শনপ্রার্থী।

শেষরাত্রে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা ভিজা পৃথিবীতে সোনালি রোদ উঠিয়াছে। মহেশ চৌধুরি ও তার স্ত্রী দুজনের গায়ে রোদ পড়িয়া দেখাইতেছে যেন মূর্তি-ধরা বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা কিন্তু অপার্থিব জ্যোতি দিয়া আবৃত। দুজনের গায়ে আবরণের মতো পড়িবে বলিয়া রোদের রংটা আজ বেশি গাঢ় হইয়াছে নাকি ?

রত্নাবলী ও উমা আসিয়াছিল সকলের আগে, রোদ উঠিবারও আগে। রত্নাবলী চোখ বড়ো করিয়া বলিয়াছিল, সমস্ত রাত এখানে ছিলেন ?

মহেশ চৌধুরি বলিয়াছিল, থাকবার জন্যই তো এসেছি মা।

মহেশ চৌধুরির কথা বলিবার ধরন পর্যন্ত যেন একরাত্রে বদলাইয়া গিয়াছে।

মারা পড়বেন যে আপনারা ?

মহেশ চৌধুরি করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতা কি প্রার্থনা শুনিবেন, এই বিপদে তাকে পথ দেখাইয়া দিবেন না ?

কাল শেষরাত্রির দিকে কতবার যে তার মনে হইয়াছে সব শেষ কবিয়া দিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া কোনো একটি আশ্রয়ে চলিয়া যায়। মনে হইয়াছে, এমনভাবে একজনকে কষ্ট দিবার কোনো অধিকার তার নাই, সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই বা এ জগতে কার কী আসিয়া যাইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই বা কার কী আসিয়া যাইবে, সব কি তার নিজেরই বিকৃত অহংকারের কথা নয় ? সাধুজির চরণ দর্শন না করিয়া উঠিবে না বলিয়া গাছতলায় ধন্বা দিয়াছে, চরণ দর্শন হইবার আগে উঠিয়া গেলে লোকেব কাছে একটু নিন্দা হইবে, লোকে বলিবে মহেশ চৌধুরির মনের জোর নাই। নিজের কাছে নিজের দামটাও একটু কমিয়া যাইবে বটে, মনে হইবে বটে যে, আমি কী অপদার্থ, ছি ! কিন্তু নিজের কথা ভাবিয়া আর একজনকে যন্ত্রণা দিলে, মারিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটাইলে, তাতে কি নিজের অপদার্থতা আরও বেশি প্রমাণ হইয়া যাইবে না, নিজের মধ্যে অশান্তি কিছু কম হইবে ?

রোদ উঠিবার পর আসিল মাধবীলতা। কে জানে কেন এ আশ্রমে কোনো ব্যাপারে সকলের চেয়ে মাধবীলতার সাহসটাই সবচেয়ে বেশি হইতে দেখা যায়। বোধ হয় কোনো কোনো ব্যাপাবে সে সকলের চেয়ে ভীৰু বলিয়া।

আসিয়াই মহেশকে সে দিতে আরম্ভ করিল বকুনি। বলিল, মাথা খারাপ হয়ে থাকে অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না ? আমরা আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি ?

অপরাধ ? অপরাধের কথা কী হল মা ?

মহেশ চৌধুরি হাতজোড় করিল।

তফাতে শতধিক নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাধবীলতার মুখেব রং যেন বোদেব সঙ্গে মিশ খাইয়া যাইবে।

তবে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? এটা তো হাট নয়, আশ্রমতো এটা ? দেখুন তো চেয়ে কী লোক জমতে শুরু করেছে ? এর মধ্যে আশ্রমের কাজ চলে কী কবে, আমরাই বা থাকি কী কবে ? একটু শান্তি পাবে বলে যাবা আশ্রমে আসে—, সাহস মাধবীলতার একটুও কমে নাই, তবে আবেগটা বাড়িতে বাড়িতে একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় গলাটা বুদ্ধ হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরি বলিল, তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে মা ? আচ্ছা আমি ওদের যেতে বলছি।

যেতে গরজ পড়েছে ওদের !

কিন্তু তারা গেল। মহেশ চৌধুরি ঘুরিয়া বসিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল, বলিল যে এই গাছতলায় তার মরণ হইবে এটা যদি তারা না চায় তবে যে যার বাড়ি ফিরিয়া যাক। ভক্তি দেখিয়া প্রথমে মাধবীলতার মনে হইয়াছিল মহেশ চৌধুরি বুঝি লম্বা বক্তৃতা দিবে, কিন্তু একটু অনুরোধ দিয়া ও নিজের মরণের ভয় দেখাইয়া কয়েকটি কথায় সে বক্তব্য শেষ করিয়া দিল এবং এমনভাবে কথাগুলি বলিল যেন শ্রোতার সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হইয়া চলিয়া গেল। বাড়ি সকলে গেল না, আশ্রমের কাছেই খবরের লোভে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল, কিন্তু গাছের জন্য ভিতর হইতে তাদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে দু-একজন করিয়া আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া মহেশকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, আশ্রমের মধ্যে আর ভিড় হইল না।

বিপিন ভিতর হইতে ব্যাপারটা লক্ষ করিতেছিল। দাঁতের ব্যথা এখনও তার সম্পূর্ণ কমে নাই, কিন্তু হয় রোদ উঠিয়াছে বলিয়া অথবা ব্যাপারটা দেখিয়া উত্তেজনা হইয়াছে বলিয়া, মাথায় জড়ানো সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া সে চূপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল।

মাধবীলতা একটা পাক দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আপনি কী চান ?

প্রভুর চরণ দর্শন করতে চাই।

শুনিয়া মাধবীলতা আবার পাক দিয়া আসিতে গেল।

বেলা বাড়িতে থাকে, ভিজা জামা ও কাদামাথা পরনের কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়, গুমোট হয় দাবুণ। মহেশ এক সময় স্ত্রীকে বলে, আচ্ছা, এবার তো তুমি ফিরে যেতে পার ?

বিভূতির মার চোখ জবাফুলের মতো লাল হইয়াছে, চোখের পাতা বুজিয়া বুজিয়া আসিতেছে। শুধু মাথা নাড়িল।

মহেশ চৌধুরি খানিকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, চলো, আমিও যাচ্ছি।

শুনিয়া বিভূতির মার লাল চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল—সাদুজির চরণ দর্শন না করেই যাবে ?

কী করব ? নারীহত্যার পাতক তো করতে পারি না।—জ্বর এসেছে না তোমার ?

হয়তো আসিয়াছে জ্বর, হয়তো আসে নাই, সেটা আর এখন বড়ো কথা নয়, বিভূতির মা এখন আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায় না। এখানে বসিবাব সময় বলিয়াছিল বটে যে স্বামী লইয়া ফিরিয়া যাইবে কিন্তু এখন আর সদানন্দের চরণ দর্শনের আগে সেটা কবিত্তে চায় না। স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভয়ে ? ভয় সেটাই বটে, কিন্তু মহেশ যা ভাবিতেছে তা নয়, স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ভাবনায় তো বিভূতির মার ঘুম আসিতেছে না ! এখন বড়ো ভয় এই যে, এত কাণ্ডের পর তাব পাগল স্বামী সদানন্দের দর্শনলাভ না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলে তার সঙ্গে সে ঘর করিবে কী করিয়া ? সেই তিলে তিলে দিনের পর দিন দক্ষানোর চেয়ে এইখানেই একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক !

যুক্তিটা যে খুবই জোরালো, তাদের সম্পর্কেব হিসাব ধরিলে প্রায় অকটা, মনে মনে মহেশ তা অস্বীকার কবিত্তে পারিল না, কিন্তু অনাহারে অনিদ্রায় রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছতলায় বসিয়া বসিয়া দিবারাত্রি কাটানোর পর যুক্তিতে বেশি কিছু আসিয়া যায় না, পরের কাছে বিনয়ে কাদা হইয়া হাতজোড় করা যায় কিন্তু নিজের লোকের অবাধাতায় গা জুলিয়া যায়। মহেশ চৌধুরিব দাঁতে দাঁত ঘষিবার প্রক্রিয়াটা কাছে দাঁড়াইয়া কেউ লক্ষ কবিলে চমকাইয়া যাইত।

তুমি থাক তবে, আমি ফিরে চললাম।

যাও।

আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে ?

কী করব না বসে থেকে ? এখন গেলেই চিরকাল তুমি আমায় দুঃবে, বলবে আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে।

তোমায় দুঃবে ?

দুঃবে না ?

খানিকক্ষণ হতভঙ্গের মতো স্ত্রী মুখেব দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, আমি নিজেই যখন চলে যাচ্ছি, তোমায় দুঃবে কেন ?

এবার বিভূতির মা যেন একটু রাগ কবিয়াই বলিল, দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়, ও সব মারপ্যাচ আমাদের মধ্যে চলবে না, রাস্তার লোককে ও সব বলে বুঝিয়ে। নিজেই চলে যে যাচ্ছ তুমি, কার জন্য যাচ্ছ শূনি ? বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে সেটা তলে তলে দক্ষাবে কাকে শূনি ? তোমায় চিনতে তো আমার বাকি নেই। তুমি হলে...তুমি হলে...মাথা নত কবিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কেন্দো না। বলিয়া মহেশ চৌধুরি বিহুলের মতো বসিয়া রহিল। এ জগতে কোনো প্রশ্নেরই কি শেষ নাই ? মানুষ বিচার করিবে কী দিয়া ? খুঁজিলেই সত্যের খঁত বাহির হয়, নিজে খোঁজ বন্ধ

করিয়া দিলেও রেহাই নাই, প্রতিনিধি যদি খোঁজে, নিজের জ্ঞানবুদ্ধির হিসাবে তাতেও খুঁত বাহির হওয়া আটকায় না। নিজে যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে পারিলেই অন্যো তা মানিবে কেন, অন্যোও যা হোক কিছু ঠিক করিয়া নিতে গিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করিবেই। সুতরাং এখন কর্তব্য কী ? যা ভালো মনে হয় তাই করা ?

কী করা ভালো ?

হে মহেশ চৌধুরির জীবন্ত দেবতা—

না, দেবতার কাছে আবদার চলিবে না। দেবতার কী জানে মহেশ চৌধুরি ? দেবতা ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোনটা মারপ্যাঁচ আর কোনটা মারপ্যাঁচ নয়, তা কী সে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছে, যেমন জানিতে পারিয়াছে স্বামী নামক দেবতা সম্বন্ধে তারই সম্মুখে উপবিষ্টা তারই এই স্ত্রীটি ? এ রকম না জানিলেই বা কর্তব্যনির্ণয় চলিবে কেন ? মহেশ চৌধুরির ক্রেশ বোধ হয়। দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নিজের সংযোগটা কেমন সে সম্বন্ধে নিজের পরিষ্কার ধারণা নাই, এ কেমন আত্মসমর্পণ ? চোখ-কান বুজিয়া বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিজেকে দিলেই কি আত্মসমর্পণ হয় ? কোনো প্রত্যাশা না থাকিলেই ? তবে সদানন্দের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় করিতে তাঁর এত কষ্ট হয় কেন, কর্তব্য নির্ণয় করিয়াও এক মুহূর্তের জন্যও কেন নিঃসন্দেহ হইতে পারে না যে যা ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক ? তার সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় কবিত্তে তার স্ত্রীর কেন একবারও দ্বিধা করিতে হয় না, ভুল করিবার ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না ? মহেশ চৌধুরি কি তবে স্ত্রীলোকেরও অধম ? অথবা— ?

একটা প্রশ্ন যেন মনের তলায় কোনখানে উঁকি দিতে থাকে, মহেশ চৌধুরি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা রহস্যময় দুর্বোধ্য অনুভূতি হইতে থাকে। আসল কথা, বিভূতির মার শেষ কথাগুলিতে সে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সকল বিষয়ের মূলা নির্ণয়ের অভ্যস্ত মানসিক প্রক্রিয়াটা একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া খাইয়াছিল। সমস্ত চিন্তাব মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছিল, এ কথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এ জগতে আর কারও সঙ্গে তো তা নেই, কোনো রকম মারপ্যাঁচ ওর সঙ্গে আমার তো চলতেই পারে না ? কী আশ্চর্য !

তারপর মাধবীলতা এক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন আপনারা সাধুজিব চরণ দর্শন কববেন।

মহেশ যেন বিশেষ অবাকও হইল না, কৃতার্থও বোধ করিল না। সহজভাবে কেবল বলিল, অনুমতি দিয়াছেন ?

এ কথার জবাবে মাধবী বলিল, প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু, কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।

আমরা দুজনেই যাব তো ?

হ্যাঁ, আসুন।

কিন্তু বিভূতির মা স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে আসে নাই, সে উঠিল না। বলিল, আমি এখন থেকেই মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি, তুমি যাও প্রণাম করে এসো।

একা যাইতে মহেশের ভালো মন সরিতেছিল না, একসঙ্গে এত দুর্ভোগ সহ্য করিবার পর সাফল্যাটা ভোগ করিবে একা ? একটু অনুরোধ করিল, বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল যে এমন একটা অনুগ্রহ পাইয়া কী হেলায় হারাইতে আছে ? কিন্তু বিভূতির মা কিছুই বুঝিল না। তখন মাধবীলতার সঙ্গে মহেশকে একাই ভিতরে যাইতে হইল। কাপড়ে কাঁদা লাগিয়াছিল, এখন শূকাইয়া পাঁপড়ের

মতো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহেশ একবার ভাবিল কাপড়টা বদলাইয়া সদানন্দের সামনে যায়, তারপর আবার ভাবিল, থাক, হাঙ্গামায় কাজ নাই। সদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা বিপিনের বদলে মাধবীলতার মধ্যস্থতায় হইতেছে কেন এ কথাও মহেশের মনে হইতেছিল। ভাবিল, তার কাছে নিজে নত হইতে বিপিনের হয়তো লজ্জা করিতেছিল, তাই মেয়েটাকে দূতী কবিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সদানন্দের অভ্যর্থনা এ ধারণা তাব মন হইতে বলপূর্বক দূর করিয়া দিল। রাগে আগুন হইয়া সদানন্দ বলিল, এর মানে ? আমি না বারণ করে দিয়েছি সাতদিন কেউ আমার দর্শন পাবে না ?

সদানন্দ নদীর দিকে জানালার কাছে পাতা চৌকিতে বসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল। মহেশ তখন ঘবের চৌকাঠ পাব হইয়াছে, সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধবীলতা তাড়াতাড়ি চৌকিব কাছে আগাইয়া গেল। নিচু গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আপনাব পায়ে ধরছি রাগ কববেন না। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, আমি সমস্ত বলছি আপনাকে। আপনি শুধু এই ভদ্রলোককে একবার প্রণাম কবে চলে যেতে দিন। বলিয়া মুখ আরও তুলিয়া সদানন্দের চোখে চোখে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলিল, দেবেন না ?

সদানন্দ বলিল, আচ্ছা।

আসুন, প্রণাম কবে যান।

মহেশ নড়ে না দেখিয়া সদানন্দও ডাকিয়া বলিল, এসো মহেশ।

মহেশ অবাধ্য শিশুব মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, না প্রভু, আপনি আমায় ডাকেননি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনাব কাছে আমি এ কী অপরাধ করলাম প্রভু ! আপনি ডাকেননি জানলে তো আমি আসতাম না।

সদানন্দ শাস্তভাবে বলিল, তাই নাকি ? তা, এখন কী করবে ?

আমি ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম কবে যাব।

মাধবীর মুখখানা পাংশু হইয়া গিয়াছিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আবার গাছতলায় গিয়ে ধমা দেবেন ? মবে যাবেন যে আপনাবা দুজনেই ?

মুখের চেয়ে মাধবীর চোখের পরিবর্তন ঘটিতেছিল বিচিত্রতর, এবাব চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কত ভাবিয়া কত হিসাব কবিয়া নিজের দায়িত্বে এত বড়ো একটা কাজ করিতে গিয়া বুকটা ভয়ে ও উত্তেজনায় টিপটিপ করিতেছিল, সদানন্দ দেবতা না দানব মাধবীর জানা নাই কিন্তু এমন ভয় সে করে সদানন্দকে যে কাছে আসিলেই তার দেহমন কেমন একসঙ্গে আড়ষ্ট হইয়া যায়, সদানন্দ তাকে বুক তুলিয়া লইলেও যে জন্য সে নূতন কিছুই আব অনুভব কবিতে পারে না, অনায়াসে সদানন্দের মুখের দিকে পাঁটপাঁট করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে তো গা এলাইয়া দেওয়ার কথা, কোনো হাঙ্গামাই তাতে নাই। এতকাল নিজের ও সদানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু ঘটয়াছে তাতে তার নিজের কিছুই করিবার বা বলিবার থাকে নাই, সদানন্দই সমস্ত করিয়াছে ও বলিয়াছে। আজ প্রথম নিজেকে মানুষটার নিষেধ অমান্য করিতে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া ভিতরটা তাব আবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাই, তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ কবিয়া মহেশ আবার গাছতলায় ধমা দিতে যাইবে এই আশাভঙ্গের সুযোগ অবলম্বন করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার উদ্দেশ্যটা যথার্থীতি সফল হইলে, সদানন্দকে প্রণাম করিয়া মহেশ বাড়ি ফিরিয়া গেলে, অন্য কোনো উপলক্ষে সে অবশ্য কাঁদিত। উপলক্ষ না পাইলে বিনা উপলক্ষেই কাঁদিত।

সদানন্দ অপলক চোখে মাধবীলতার চোখে জল ভরিয়া উপচিয়া পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখিতেছিল। এ দৃশ্য সে আগেও দেখিয়াছে, মাধবীর চোখ তখন তার চোখের আরও কাছে ছিল। তবু এমন স্পষ্টভাবে আর কোনোদিন কি মাধবীর চোখের কান্না দেখিয়াছে ইতিপূর্বে ?

একটু ভাবিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।

পরীক্ষা প্রভু ?

হ্যাঁ। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার এক মুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তুমি আসবে বলে দরজা খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভান করছিলাম, আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ ? এখন বাড়ি যাও, কদিন বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে এসে দেখা করো। দেখি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পাবি কিনা।

শুনতে শুনতে টলিতে টলিতে মহেশ চৌধুরি কোনোরকমে খাড়া ছিল, সদানন্দের কথা শেষ হইলে প্রণাম করিবার জন্য আগাইতে গিয়া দড়াম কবিয়া পড়িয়া গেল।

সুতরাং বিভূতির মাকেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে আসিয়া সদানন্দের চরণ দর্শন করিতে হইল। শশধরও আসিল। বিপিন আসিয়া চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার শুধু সে চোখ তুলিয়া চাহিল সদানন্দের দিকে, তারপর আর মনে হইল না যে আশেপাশে কী ঘটতেছে এ বিষয়ে তার চেতনা আছে।

আধঘণ্টা পরে মহেশ চৌধুরিকে একটু সুস্থ করিয়া এবং একটু গরমদুধ খাওয়াইয়া শশধর ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে দেখা গেল বিবাট কাণ্ড হইয়া আছে—শ-দুই নরনারী সেই কদম গাছটার তলে ভিড় কবিয়া দাঁড়াইয়া। শ্রীধরকেও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল।

মহেশকে দেখিয়া জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—মহেশ চৌধুরিকী জয় !

জনতার মধ্যে একজনও অবাঙালি আছে কিনা সন্দেহ, মহেশ চৌধুরিও যে খাঁটি বাঙালি সন্তান তাও কারও অজানা নাই, তবু জয়ধ্বনিতে মহেশ চৌধুরির নামের সঙ্গে কোথা হইতে যে একটি 'কী' যুক্ত হইয়া গেল !

তারপর কয়েকজন যুবক মহেশ চৌধুরিকে কাঁধে চাপাইয়া গ্রামের দিকে বওনা হইয়া গেল। কাঁধে চাপাইল একরকম জোর করিয়াই, মহেশ চৌধুরির বারণও শুনিল না, বিভূতিও মাঝে মাঝে কান্না মিনতিও কানে তুলিল না।

যতক্ষণ দেখা গেল গ্রামের সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোটো ছোটো দলে আরম্ভ হইল আলোচনা। বিপিনও সদানন্দের কুটিরের সামনে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করিয়াছিল, শোভাযাত্রা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে কাহারও সঙ্গে একটি কথা না বলিয়া সে সটান গিয়া নিজের বিছানায় শূইয়া পড়িল। সে যেন হার মানিয়াছে, হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা দাঁতের ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মাধবীলতা সদানন্দের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার ব্যাখ্যা ও কেফিয়ত বাকি আছে।

সদানন্দ সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিল, এসো মাধবী।

কোথায় আসিবে মাধবী ? কাছে ? পাঁচ-সাতহাত তফাত হইতে এমনভাবে ডাকিলে তাই অর্থ হয়। মহেশ চৌধুরি খানিক আগে টলিতে টলিতে সদানন্দের দিকে আগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, মাধবীলতা কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরির মতো দড়াম করিয়া পড়িয়াও গেল না। কিন্তু কাছে যাওয়ারও তো একটা সীমা আছে ? তাই হাতখানেক ব্যবধান থাকিতে মাধবীলতা থামিয়া পড়িল।

সদানন্দ হাত ধরিয়া তাকে পাশে বসাইয়া দিল। চিবুক ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া বলিল, মাধবী, তুমি তো কম দুষ্ট মেয়ে নও !

ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।

তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। সদানন্দ একমুখ হাসিল।

মাধবীলতা থামিয়া থামিয়া সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সদানন্দকে জানাইয়া দিল, নিজের কাজের কৈফিয়তে বলিল যে সদানন্দ পাছে বাড়ি না হয় এই ভয়ে একেবারে মহেশ চৌধুরিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

বলিয়া মাধবী হঠাৎ দাবি করিয়া বসিল সদানন্দের কৈফিয়ত, কাঁদো কাঁদো হইয়া বিনা ভূমিকায় সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে ?

আমি তো জানতাম না মাধবী এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তুমি ডেকে এনেছ জানলে কী আর আমি রেগে উঠতাম ?

না, তা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন ? কেন বললেন আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন ?

সদানন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন, ওটা কী জান মাধবী ?

কিন্তু মাধবী কী ও সব কথা কানে তোলে ? আকুল হইয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল আর বলিতে লাগিল, কেন আপনি মিছে কথা বললেন। কেন বললেন !

ছয়

আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া বোদ উঠিল, বিপিনের দাঁতের বাথা কমিয়া গেল, কিন্তু তাব মুখের ব্যথিত ভাবটা যেন ক্ষুদ্র বিষাদের মেকি ইন্সপাতে গড়া মুখোশেব মতো হইয়া রহিল কায়েমি। বাগ হইলে বীববাসের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা বিপিনের অভ্যাস নয়। সদানন্দের মতো যারা তাব খুব বেশি অন্তর্ভঙ্গ তাদের কাছে কদাচিৎ তাকে রাগ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেও যেন কেমন এক খাপছাড়া ধবনের বাগ। রাগ বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, ঠোট বাঁকইয়া, মুখের চামড়া এখানে-ওখানে কুঞ্চিত করিয়া বাঁকা চোখে চাহিবার একটা আশ্চর্য কৌশল সে কোনো এক সময় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আয়ত্ত রাখার জন্য রাগ কবার সুযোগে প্র্যাকটিস করিতেছে। এবার বিপিনের মুখ দেখিয়া সদানন্দও বুঝিতে পাবিল সে রাগ করিয়াছে, কিন্তু আগেকাব বাগ কবাব ভঞ্জির সঙ্গে একেবারে মিল না থাকায় ভাবনায় পড়িয়া গেল।

তোর কী হয়েছে রে বিপিন ?

কিসসু না। হবে আবার কী ?

বিপিনের কী হইয়াছে বোঝা গেল না, কিন্তু জবাবটা বোঝা গেল। বিপিন নিজেই জানে না তার কী হইয়াছে। এ রকম ব্যাপার সকলের জীবনে সর্বদাই ঘটতেছে, নিজের কিছু একটা হয় কিন্তু নিজেব কাছে সেটা দুর্বোধ্য থাকে, এমন কিছু গুরুতর ঘটনা এটা নয়, সদানন্দ তা জানে। তবে নিজের কী হইয়াছে বুঝিবার চেষ্টাটা প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে দাঁড়াইয়া গেলে তখন হয় বিপদ, অধ্যবসায়টাই সাংঘাতিক গুরুত্ব পাইয়া বসে। এবং মাঝে মাঝে কমবেশি সময়ের জন্য এ রকম অধ্যবসায় মানুষের আসে বইকী। বিপিনের কি তাই হইয়াছে ?

কী ভাবছিস ভাই ?

ভাই ? সদানন্দের সম্বোধনে বিপিনের তো রীতিমতো চমক লাগেই, মনেও হয় যে সে বুঝি তাকে হঠাৎ গাল দিয়া বসিয়াছে। এমন সম্পর্ক তো তাদের নয় যে এমন গভীর স্নেহাভ্যাসে সুরে ভাই বলিতে হইবে, এতখানি আবেগময় আন্তরিকতার সঙ্গে। পরস্পরকে জানিয়া বুঝিয়া তাদের বন্ধুত্ব, পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে যেমন তাদের লজ্জা করে না, মনের দুর্বলতা আর বিকৃতি মেলিয়া ধরিতেও তেমনই ভয় বা সংকোচ হয় না, অন্তত কিছুকাল আগে তাই ছিল। এ ভাবে দরদ

দেখানো তাদের মধ্যে চলিবে কেন ? কী হইয়াছে সদানন্দের আজ, সাতদিন ঘরের কোণে কাটাইবার পর ? বিপিন সন্দিক্ত দৃষ্টিতে তাকায়, সে দৃষ্টির বিশ্লেষণপটুতা অসাধারণ। বিপিন উশখুশ করে, সেটা তার শারীরিক অক্ষতিবোধের চরম প্রমাণ।

তখন দুপুরবেলা, ঘন্টা দুই আগে দুজনেরই মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়া মনকে আরও বেশি অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংঘমের মধ্যে নিজেকে সত্যসত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত সদানন্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে তাই হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে ? সকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে চোখে পড়িল ন্নানরতা রত্নাবলী আর উমাকে, তাই মাধবীলতাকে খুঁজিতে সে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল আশ্রমের দিকে। মাধবীলতাকে দেখা গেল এক আমগাছের তলে। আশ্রমে যে গোয়ালা দুধ জোগায়, তার বউয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। গোয়ালা বউয়ের কাঁথের শিশুটি প্রাণপণে স্তন চুষিতেছিল, দুধের কারবার করে বটে গোয়ালাবউ, নিজের বুক যে তার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ জন্মে না, দেখিলেই সেটা বোধা যায়।

সদানন্দকে দেখিয়া গোয়ালা বউ সরিয়া গিয়াছিল।

রাত্রে একবার আমাব ঘরে আসবে, মাধু ?

আদেশ নয়, অনুরোধ। মাধবীলতা নয়, মাধবী নয় মাধু। পবে দুপুরবেলা বিপিনকে ভাই বলার ভূমিকার মতো।

রাত্রে ? কখন ?

যখন তোমার সুবিধা হয়।

সন্দেবেলা ?

না, একটু রাত করে এসো। এই এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়। অনুরোধ নয়, আদেশ। এতক্ষণে মাধবীলতা বুকিতে পারিয়াছিল, আহ্নানটা খাঁটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল আজ তার সমাধি।

আজ নয়, পরশু যাব। একটা হাত বাড়াইয়া মাধবী আমগাছের গুঁড়িতে স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে ছিল পিপড়াদের সারি বাঁধিয়া যাতায়াতের পথ।

না, আজ।

আদেশ নয়, প্রায় ধমক।

আজ নয়, পরশু।

মিনতি নয়, মৃদু কোমল নিরুপায় বিদ্রোহ।

সদানন্দ তখন অন্ধ আর বোকা হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঁচ বছরের প্রিয়াকে লজেনচুসের লোভ দেখানোর মতো কোমলকণ্ঠে বলিয়াছিল, তুমি কিছু বোঝ না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘ-টোষ নঃ করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। এসো কিন্তু।

পরশু কি জ্যোৎস্না উঠিবে না ? পরশু কি জ্যোৎস্নায় বসিয়া গল্প করা চলিবে না ? কিন্তু প্রতিবাদের যতটুকু শক্তি মাধবীর ছিল এতক্ষণে প্রায় সবটুকুই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার যদি সদানন্দ রাগিয়া যায় ? দুঃশাসন জানিয়াও যা বোঝে নাই, সদানন্দ কী না জানিয়া তা বুকিবে ? তবু মাধবী অন্যভাবে চেষ্টা করিয়াছিল।

উমাশশী, কুন্দ ওরা টের পাবে যে ? একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আমি সে ব্যবস্থা করব।

সদানন্দ নিজেই যখন ব্যবস্থা করিবে তখন আব কার কী বলিবার থাকিতে পারে ? একটিবার পশ্চিমে উঠিবার সাধ যদি সূর্যের থাকে, একমাত্র সদানন্দের হুকুমের সুযোগেই সাধটা মিটাইবার সম্ভাবনা কি তার সবচেয়ে বেশি নয় ?

এই জন্য সদানন্দ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পারে নাই। আহ্বারে বুচি ছিল না। এখন সদানন্দের তাই ক্ষুধা পাইয়াছে। এদিকে দাঁতেব ব্যথা না থাকায় কদিন প্রায় উপবাস করিয়া থাকিবার শোধ তুলিবার জনাই বোধ হয় বিপিন এত বেশি খাইয়া ফেলিয়াছিল যে এখন অস্থলে বুক জ্বলিতেছে। নিজেকে বিপিনের বড়েই ভেঁতা মনে হইতেছিল। সদানন্দের আদবের জবাবে সে তাই বলিল, ভাবছি তোম মাথা।

তাবপর ঘরে আসিল মাধবী। ঘরে ঢুকিয়াই বিপিনকে সদানন্দের সঙ্গে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সদানন্দ বলিল, কী মাধবী ?

কিছু না, এমনি এসেছিলাম। বলিয়া বোকার মতো একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মাধবী প্রায় চলিয়া যায়, সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাব কাছে গেল।—শোনো মাধু, শোনো।

কাছে গিয়া গলা নামাইয়া বলিল, কিছু বলবে ? চলো বাইবে যাই।

দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল, বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকা চোখে চাহিয়া বহিল খোলা দরজার দিকে।

মাধবীলতা বাহিরে আসিয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না। সদানন্দ চিবুক ধরিয়া তার মুখখানা উঁচু করিয়া ধরে। এটা সদানন্দের যেন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কী বলবে বলো ?

কী আব বলিবে মাধবী, সেই পুৰাতন কথা। আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া আজ রাত্রির অভিসার পিছাইয়া দিবাব জন্য অনুবোধ করিতে আসিয়াছে।

সদানন্দ জোর করিয়া মাধবীর মুখ উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ হাত সবাইয়া নেওয়ায় মাধবীর চিবুক প্রায় কঠাব সঙ্গে ঠুকিয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের মন সতাই একটা চিন্তার সঙ্গে ঠোকর খাইয়াছে। কেন যে হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল বড়ো পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড়ো ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যাব মতো। দেহটা যে বেশি পাকা আমের মতো কোমল আর বঙিন মাধবীর, আদর করিয়া তাহার দেহে হাত বুলানোর সময় আঙুলগুলির যে পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া যাওয়া খুবই উচিত, সদানন্দ তা জানে। কিন্তু মাধবীর ভিতরটা শুধু শক্ত নয়, পাথব। বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মতো বছরের পব বছব ধরিয়া শুকাইয়া কুকড়াইয়া যাইতে পারিলে যেমন হইতে পারে সেই রকম শক্ত, এই ধরনের একটা চিন্তা মনে আসায় সদানন্দের কাছে মাধবীর দেহটা পর্যন্ত রংচটা কাঠের খেলনাব মতো কুৎসিত হইয়া গেল।

কিন্তু—

কথাটা মনে হইল মাধবীকে বিদায় দিয়া ঘরের মধ্যে বিপিনের কাছে চৌকিতে গিয়া বসিবার পর : আশ্রমে যে আসিয়াছিল কুমাবী মাধবী ? তাই তো !

ঠিক এই সময় সদানন্দ আর বিপিনের মধ্যে একটু কলহ হইয়া গেল। কত কলহ বিবাদই আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে হইয়াছে, কী তীব্র ঝাঁজ সে সব ঝগড়ার, মনে হইয়াছে জীবনে বুঝি আর দুজনের মধ্যে মিল হইবে না, কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবে না। কিন্তু কখন আবার বিনা ভূমিকায় দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে নিজেদেরই তাদের খেয়াল থাকে নাই। আজিকার কলহটা একেবারেই সে রকম হইল না। দুজন পুরুষের মধ্যে, বিশেষত বিপিন আর মানিক ৩য়-২১

সদানন্দের মতো দুজন পুরুষ বন্ধুব মধ্যে এত মৃদু, এতখানি ভদ্রতাসম্মত কলহ হইতে পারে, এতদিন কে তা ভাবিতে পারিত !

বিপিন বলিল, ওটাকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি করছিস সদা।

সদানন্দ বলিল, তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।

বিপিন বলিল, ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।

সদানন্দ বলিল, তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি ?

বিপিন বলিল, অধিকারের কথা নয়। ওর ভালোমন্দের একটা দায়িত্ব আমার আছে ?

সদানন্দ বলিল, অ ! ভালোমন্দের দায়িত্ব !

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কী কলহ ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জুলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আর একজনের কত অন্যায্য, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে সত্যই জ্যোৎস্না উঠিল। আকাশে একেবারে যে মেঘ রহিল না তা নয়, বর্ষাকালের আকাশ তো। কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলেই তো জ্যোৎস্নার শোভা বাড়ে, অনেক দিনের বিশ্বাস এটা। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিপিন বাহির হইয়া পড়িল, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল আশ্রমের এক কুটির হইতে অন্য কুটিরে। যে কোনো সময় আশ্রম পবিদর্শনের অধিকার বিপিনের আছে। রাত্রির অসংখ্য বিচিত্র শব্দ আছে, কত তুচ্ছ অদৃশ্য প্রাণী শুধু শব্দের মধ্যে প্রাণের পরিচয় ঘোষণা করিয়া চলে, তবু দিনের চেয়ে রাত্রিতে স্তব্ধতা গভীরতর। দিবারাত্রি আশ্রমকে ঘুরিয়া যে নিবিড় শান্তি বিরাজ করে, বাহিরের তপ্ত মানুষকে যা জুড়াইয়া দেয় চোখের নিমেষে, রাত্রে যেন সেই শান্তির ভাব আরও বেশি অপার্থিব হইয়া ওঠে। চোখ জুড়াইয়া যায় বিপিনের চাবিদিকে চোখ বুলাইয়া, মন ভরিয়া যায় মন-জুড়ানো আনন্দে, কোনো কোনো বাত্রে নিজেকে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন পর্যন্ত যেন সে দেখিতে আরম্ভ করিয়া দেয়—অবাস্তব, অর্থহীন, কোমল মধুর স্বপ্ন-আদর্শের যে অবাধ্য, অপরিত্যাজ্য লেজুডকে বিপিন ঘণাই করে চিরদিন।

আজ স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, একটু গর্ব পর্যন্ত অনুভব করিল না। নিজের ঘব হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের ছড়ানো কুটির আর রহস্যময় ছায়ালোকবাসী নির্বাক নিশ্চল দৈত্যের মতো ছোটোবড়ো গাছগুলি দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তাব শুধু মনে হইল, কী অকৃতজ্ঞ সদানন্দ, কী স্বার্থপর সদানন্দ, কী বিশ্বাসঘাতক সদানন্দ ! নিজে রাজ্য সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া সদানন্দকে রাজা করিয়াছে যে, আজ সদানন্দ তাকেই হীন মতলববাজ মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ করে। অন্যমনে বিপিন এক কুটিরের অধিবাসীদের সঙ্গে দুটি-একটি কথা বলিয়া অন্য কুটিরে চলিয়া যায়। কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ শয়নের আয়োজন করিতেছে, কেহ আসনে বসিয়া চিন্তাসাধনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেহ বারান্দায় বসিয়া করিতেছে মেঘের গতিতে চাঁদের গতি সৃষ্টির ভ্রান্তিকে উপভোগ।

উমা আর রত্নাবলীর কুটিরের সামনে আসিয়া বিপিনের অনামনস্কতা ঘূচিয়া গেল। বারান্দার নিচে দাঁড়াইয়া আছে শশধর, বারান্দায় থাম ধবিয়া দাঁড়াইয়া তার সঙ্গে কথা বলিতেছে রত্নাবলী।

চিনিতে পরিয়াও বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে ?

শশধর উৎসাহের সঙ্গে বলিল, আমায় চিনলেন না ? সেই যে সেদিন—

রত্নাবলী সোজাসুজি বলিল, উর্নি মহেশবাবুর ভাগনে।

বিপিন বলিল, এত রাত্রে আপনি এখানে কী করছেন ?

বিপিনের গলার সুরে শশধরের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছিল, সে আমতা আমতা কবিতা বলিল, মহেশবাবু বললেন কিনা—

তার হইয়া রত্নাবলী কথাটা পবিদ্ধার করিয়া বুঝাইয়া বলিল, মহেশবাবুব খুব অসুখ, একশো চারে জুর উঠেছে ; মাধবীকে একবার দেখবার জন্য বড়ো ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। শশধরবাবু তাই বলতে এসেছেন, মাধবী যদি একবার যায়—

এত রাত্রে ? দিনের বেলা বলতে এলেই হত।

বিপিনের আবির্ভাবেই বত্নাবলী যেন বিরক্ত হইয়াছিল, জেরা আরম্ভ করায় সে যেন রাগিয়া গেল।—আপনি বুঝছেন না। দিনের বেলা অতটা ব্যাকুল হননি। এখন এত বেশি ছুটফট কবছেন যে শশধরবাবু ভাবলেন, মাধবীকে যেতে বলে গেছেন এ খবরটা জানালে হয়তো একটু শান্ত হবেন। তাই এখন বলতে এসেছেন। নইলে এত রাত্রে ওঁব আশ্রমে আসবার দরকার !

এত কথা একসঙ্গে বত্নাবলী কোনোদিন বলে না। চাঁদেব আলোতেও বোঝা যায়, বত্নাবলীর দাঁতগুলি কী ধবধবে। ব্যাপারটা বিপিনের একটু জটিল মনে হইতে লাগিল। মহেশ চৌধুরি খুব অসুখ হইয়াছে, মাধবীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, শূণ্য এই ব্যাপারটুকুই কম জটিল নয়। জগতে এত লোক থাকিতে মাধবীলতাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা কেন ? কতটুকুই বা তার পরিচয় মাধবীর সঙ্গে ! মাধবীলতাকে কথাটা জানাইতে এত রাত্রে আশ্রমে আসিয়া রত্নাবলীর সঙ্গে শশধরের গল্প জুড়িয়া দেওয়াটাও জটিল ব্যাপার বইকী। উমা আর মাধবীলতার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা আবও বেশি জটিল।

জিজ্ঞাসা করায় রত্নাবলী বলিল, ওবা খাচ্ছে।

এখনও খাওয়া হয়নি কেন ?

বত্নাবলী মাথাব একটা ঝাঁক দিয়া ঝাঁজালো গলায় বলিল, কাবণ আছে, ও সব মেয়েদের ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। পারি না বাপু আব আপনার কথার জবাব দিতে !

মনে মনেও কোনোবকমেই বিপিন বাগ কবিতে পারিতেছিল না, আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করা, তাব উপর এখন কড়া কথা বলা কিছুই যেন তাব কাছে গুরুতর মনে হইতেছিল না। আশ্রমের নিয়মেই যেন এ সব ঘটতেছে, আগাগোড়া যেন তার নিজেবও সমর্থন আছে। একটু ভাবিল বিপিন, তারপর কোনোবকমে গলা গম্ভীর কবিতা বলিল, আপনি ভেতরে যান, রাত্রে কেউ কোনো দরকারে আশ্রমে এলে এবাব থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি বাড়ি ফিরে যান শশধরবাবু, মহেশবাবুকে বলুন গিয়ে মাধবীকে সঙ্গে কবে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

আজ রাত্রেই যাবেন ?

অসুখ-বিসুখের সময় কি দিনবাত্রির বিচার কবলে চলে ? সময় বুঝে মানুষের অসুখ হয় না। বড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁব সামান্য একটা ইচ্ছা যদি আমবা না পূর্ণ কবতে পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন ? নিজেবা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রমবাস কবি না শশধরবাবু।

শশধর অভিভূত হইয়া দাঁড়ইয়া থাকে। বিপিন তাগিদ দিয়া বলে, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আপনি যান। বলুন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা যাচ্ছি।

শশধর চলিয়া গেলে রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল, এত দূব রাস্তা যাবেন কী করে ? হেঁটে ? সে ভাবনা তো আপনাকে ভাবতে বলিনি ? আপনাকে যা বললাম তাই কবুন, ঘরে গিয়ে শূয়ে পড়ুন।

রত্নাবলী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আমি সঙ্গে যাব না ?

বিপিন বলিল, না।

এত রাতে বিপিন একা মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাইবে। মহেশ চৌধুরির বাড়ি কাছে নয়, আশ্রম হইতে প্রায় চার মাইল পথ। বিপথে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গেলে পথ কিছু সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এখন বর্ষাকালে দিনের বেলাও সে পথে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আশ্রম হইতে বাগবাদা যাইতে হইলে সাতুনার গা ঘেঁষিয়া যাইতে হইবে, সাতুনা বেশি দূরে নয়। সাতুনা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পথের ধারে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজন গৃহস্থের খানকয়েক বাড়ি আর খেতখামার পাওয়া যায়, তাদের কারও কারও গোবুর গাড়ি আছে, বিপিন কি লোক পাঠাইয়া গোবুর গাড়ি আনাইয়া লইবে? অথবা মাধবীকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, পথে ওই ছোটো পাড়াটিতে হোক, সাতুনায় হোক, কারও কাছে সংগ্রহ করিয়া লইবে গোবুর গাড়ি? গোবুর গাড়ি না পাওয়া গেলে হাঁটিয়াই হাজির হইবে বাগবাদায় মহেশ চৌধুরির বাড়িতে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়, আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষান্তবর্ষার রাত্রি রত্নাবলীকে ঘিরিয়া আছে, নির্জন পথ বাহিয়া দুজন হাঁটিয়া চলিয়াছে ঘুমন্ত গ্রামের গাঁ ঘেঁষিয়া, পথের খানিক খানিক ভিঙ্গা চাঁদের আলোয় ঢাকা আর খানিক বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার, কোথাও ঘোপঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দুদিকেই জলভরা খেত : হাঁটিয়া চলিতে চলিতে দুজনে কখন উঠিয়া বসিয়াছে গোবুর গাড়িতে ছাউনির মধ্যে, গাড়ির দোলনে এদিক-ওদিক টলিতে টলিতে কখন তারা জড়াইয়া ধরিয়াছে পরস্পরকে, কখন শশধরের দুটি হাত অন্ধের দুটি হাতের মতো রত্নাবলীর সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে ঝুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে রত্নাবলীর সর্বাঙ্গের পরিচয়— একা বিপিনের সঙ্গে একাকিনী মাধবীর এত রাতে মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ও অসঙ্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে রত্নাবলীর গায়ে সতাই কাঁটা দিয়া ওঠে! বিপিনের কী মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? কাল মাধবীকে নিয়া গেলে চলিবে না মহেশ চৌধুরির বাড়ি?

কী ভাবছেন? খাওয়া হয়ে থাকলে মাধবীকে পাঠিয়ে দিন বাইরে।

আমিও যাই না আপনাদের সঙ্গে?

বিপিন মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিল, না না, আপনাকে স্নেহে হবে না।

আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না।

মাধু যাবে কী যাবে না সেটা আপনার কাছে না শুনে মাধু বলেই না হয় শুনাতাম?

রত্নাবলী অধীর হইয়া বলিল, বুঝেও কি বুঝতে পারেন না আপনি? এত রাতে আপনার সঙ্গে মাধুকে আমি যেতে দেব না। যদি চেষ্টা করেন নিয়ে যাবার, হইচই গড়গোল বাধিয়ে দেব।

বিপিনের যে প্রতিভা কদিন হইতে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, রত্নাবলীর মুখে এ কথা শুনিবামাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙার মতো চোখের পলকে জাগিয়া উঠিল। সতাই চোখের পলকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিপিনের চোখেই। রত্নাবলী স্পষ্ট দর্শিত্যে পাইল একবাব কী দুবার পলক পড়ার মধ্যে বিপিনের চোখ যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল অন্ধকারে হিঙ্গ্র পশুর চোখের মতো, তারপর হইয়া গেল জ্ঞানের ছানিপড়া বুদ্ধের চোখের মতো স্তিমিত।

আপনাকে নিলে আর গোলমাল করবেন না?

না। আমি সঙ্গে গেলে—

ডাকব নাকি সবাইকে?

রত্নাবলী ভয় পাইয়া বলিল, সবাইকে ডাকবেন? সবাইকে ডাকবেন মানে? কেন ডাকবেন সবাইকে?

বিপিন গম্ভীর মুখে বলিল, পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়া কি ভালো নয়? আপনি এত সংকোচ বোধ করছেন কেন, আপনি প্রথম নন, আপনার মতো দু-একজন এ ভাবে আশ্রম ছেড়ে গিয়েছে।

আশ্রম ছেড়ে যাব ? এতক্ষণ রত্নাবলী দাঁড়াইয়াছিল, এবার দাওয়ায় উঠিবার পাপটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, একটু বসি, পা ধরে গেছে। কী বলছেন আপনি বুঝতে পারছি না।

কথাটা সত্য নয়। রত্নাবলী বেশ বুঝিতে পারিতেছিল সব। অনেকদিন আগে, দেড় বছর দুবছরের কম হইবে না, সে তখন অল্পদিন হয় আশ্রমে বাস করিতে আসিয়াছে, বিপিন একদিন এমনিভাবে অসময়ে হঠাৎ সকলকে ডাকিয়াছিল। সীতা নামে একটি শিষ্যার আশ্রমে মন টিকিতেছে না, সে চলিয়া যাইবে, সকলের কাছে বিদায় চাহিতেছে। সে দৃশ্য রত্নাবলীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। কুটিরের সামনে মাটিতে বসানো দুটি লষ্ঠনের আলো সকলের মুখে পড়িয়াছে, কারও মুখে বেশি, কাবও কম। সকলে নির্বাক— পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক। এখনকার চেয়ে শিষ্য ও শিষ্যার সংখ্যা তখন কম ছিল আশ্রমে।

সীতা কাঁদিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া মুখ নিচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কয়েকদিন আগে সীতার স্বামীকে বিপিন আশ্রমেরই কী একটা কাজে দূরদেশে পাঠাইয়াছে, তিন-চারদিন পবে সে ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী নামে আশ্রমের একটি মেয়েকে বিপিন সেই কটা দিন সীতার সঙ্গে তার কুটিরের থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল। বছর বাবো বয়স ছিল কল্যাণীর আর ছিল কাঠির মতো সবু চেহারা। একটু তফাতে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে ভয়ানক চোখে চাহিয়াছিল। সীতার মুখের চেয়ে কল্যাণীর সেই দৃষ্টিই রত্নাবলীর বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সকলেই জানিত, এক ঘটনা আগে কল্যাণীর বাবাকে অবিলম্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে গোরুর গাড়ি আনিতে গিয়াছে। কল্যাণীর বাবার মতো রূপবান পুরুষ রত্নাবলী কখনও দাখে নাই। শাস্তির খোঁজে ভদ্রলোক সদানন্দেব আশ্রমে আসিয়াছিল, কিন্তু একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় বিপিনের সঙ্গে ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিয়া অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। মানুষটাকে সকলেই পছন্দ করিত, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া যাইতেছে জানিয়া সকলের দুঃখও হইয়াছিল, আনন্দও হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার সীতা-সংক্রান্ত আকস্মিক পরিণতিতে সকলে খাতোমতো খাইয়া গিয়াছিল।

তারপর বিপিন সীতাকে বলিয়াছিল, আপনি তবে তৈরি হয়ে নিন। তখন সীতা বলিয়াছিল, আমি যাব না। উনি না ফিবে এলে এক পা নড়ব না আমি এখন থেকে।

বিপিন যেন স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল, সে কী ?

সীতা প্রায় আত্ননাদ করিয়া বলিয়াছিল, উনি নেই, এ ভাবে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।

বিপিন গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কে ?

কল্যাণীর বাবা গোরুর গাড়ি আনিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিদায় হইয়া গিয়াছিল, সীতা কয়েকটা দিন আশ্রমে ছিল। সীতার স্বামী কিন্তু আর আশ্রমে ফিবিয়া আসে নাই। বিপিন কি তাকে আশ্রমের কাজে বাহিরে পাঠাইয়াছিল ? বাহিরে থাকিতে আশ্রমের কোনো কথা কানে যাওয়ায় আর সে ফিরিয়া আসে নাই ? অথবা নিজেই সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল ? এই সব ছিল তখন সকলের জিজ্ঞাসা। এখনও এ সব জিজ্ঞাসাই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সীতাও যেন আশ্রম হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

বিপিন রত্নাবলীকে লক্ষ করিতেছিল। আশ্রমের নিয়ম তো আছেই, তা ছাড়া রত্নাবলী নিজেও অত্যন্ত সাবধান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রত্নাবলীর দেহটাই বড়ো বেহায়া। দেখিতে দেখিতে বিপিনের মনে হয় কী, এর কাছে কোথায় লাগে মাধবীলতা, গদির কাছে কাঁথার মতো ? তবু মাধবীলতার আকর্ষণ কত বেশি। রত্নাবলীকে এতকাল সে কি দেখিয়াও কোনোদিন চাহিয়া দেখিয়াছে ? কুটিরের হোক, নদীর ঘাটে হোক, রত্নাবলী দৃষ্টিপথে পড়িলে তাকে না দেখিয়া অবশ্য থাকা

কঠিন, অন্তত তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার আগে,—মেয়েদের দিকে তাকানো উচিত নয় মনে এই ছুতাতেও অন্তত—একটিবার রত্নাবলীকে দেখিতেই হয়, কিন্তু সে দেখা ওই দেখা পর্যন্তই। রত্নাবলী যেন আকর্ষণ করে না, কেবল মনটা বিচলিত করিয়া দেয় কিছুক্ষণের জন্য। মাধবীলতা ও রত্নাবলীব তুলনামূলক সমালোচনাটা বিপিন আগেও যে কোনোদিন করিতে পাবিত, কিন্তু এই মুহূর্তেব আগে কথাটা যেন তার খেয়ালই হয় নাই। কথাটা মনে পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে জানে, এখন তাকে এই দাওয়ায় বসাইয়া কুটিরের সামনে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নালোকে মাধবী আব রত্নাবলী যদি পরস্পরের কিছু তফাতে দাঁড়ায়, যাতে এক একটি চোখের কোণে সে এক-একজনকে আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নার আবরণ অঙ্গে চাপানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তা দেখিতে পায়, দুটি চোখই তার অপলক হইয়া থাকিবে রত্নাবলীর দিকে কিন্তু মন তাব পড়িয়া থাকিবে মাধবীলতার কাছে। অভদ্র কল্পনাটি বিপিনের রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিপিনেব নিজেবই একটা ধারণা ছিল যে মোটামুটি হিসাবে বছর ত্রিশেক বয়স হইবার পর মানুষের আর এ ধরনের কল্পনা ভালো লাগে না, ছেলেমানুষি মনে হয়, হাসি পায়—রাজা সাহেবের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো কয়েকটি নগ্না নারীর প্রকাশ্য চিত্র দেখিয়া বিপিন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যে এই ছবিগুলিব দিকে কেউ তাকাইয়াও দ্যাখে না, দেখিয়া দেখিয়া আর কারও কিছুমাত্র কৌতূহল নাই, রক্তমাংসের স্ত্রীলোকের বেলাও মানুষের তাই হয়, প্রথম বয়সটা কাটিয়া যাওয়ার পব নারীদেহ সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়া যায়। প্রথম বয়স বিপিনের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বয়সটাও প্রায় কাটিতে চলিল, তবু রত্নাবলী ও মাধবীলতা সম্বন্ধে ছেলেমানুষি কল্পনা করিতে তার ভালো লাগিতেছে কেন এটা অবশ্য বিপিন ভাবিয়া দেখিল না। রত্নাবলীর পাশে বসিয়া সে হঠাৎ একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ফেলিল—এত জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল বলিবার নয়। রত্নাবলী আরও ভয়া পাইয়া গেল। পাশে বসে কেন বিপিন ? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেন বিপিন ? অমন করিয়া তাকায় কেন বিপিন জ্ঞানীবুদ্ধের মতো ?

আপনি বড়ো ছেলেমানুষ রতন দেবী।

গা ঘেঁষিয়া বিপিন বসিয়াছে। বিপিন যদি এবাব গায়ে হাত দেয় ? যদি জড়াইয়া ধরে ? পুরুষ মানুষকে রত্নাবলী বিশ্বাস করে না। মেয়েমানুষ সব সময়েই সংযত থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ মানুষের সংযম শুধু অন্যানমনস্কতা, হয়তো পাঁচ-সাতবছর কোনো মেয়েব কথা মনেও পড়িল না, কিন্তু তার পাশে গা ঘেঁষিয়া বসিবার পর পাঁচ-সাতমিনিটের মধ্যে হয়তো এমন পাগলামি করিয়া পসিল যার তুলনা হয় না। বিপিনের কিছু হইবে না, বিপদে পড়িবে সে। সে যদি ালমাল করে, সকলে যদি বুদ্ধিতেও পারে যে দোষ আগাগোড়া বিপিনেব, তবু বিপিনের এতটুকু আসিয়া যাইবে না, মাঝা পড়িবে সেই।

উমা মাসি আসছে বোধ হয়।

সহজভাবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াও কোনো লাভ হইল না, রত্নাবলীর নিজের কানেই কথাগুলি শুনাইল যেন সে চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া প্রশ্নীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

বিপিন একটু হাসিল। আসুন না, সকলেই তো আসবেন।

সকলে আসবেন কেন ! ও কথা বলছেন কেন আপনি !

কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে কিনা মনে মনে রত্নাবলী তাই ভাবিতেছিল, গলাটা তাই কাঁদো কাঁদো শোনাইল। মেয়েদের প্রকৃতিই এই রকম—একটা কিছু করিবে কী করিবে না ভাবিতে ভাবিতে কাজটা অর্ধেক করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে নিজেকে দান করার আগে ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে নাই আত্মদান করিবে কিনা।

[লেখকের মন্তব্য . কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে কথাটা মনে রাখা দরকার। কোনো বিষয়ে আগে হইতে মনস্থির করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাটাই মনের জোরের চরম প্রমাণ হিসাবে প্রায় সকলেই গণ্য কবিয়া থাকে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওটা গোঁয়ারতুমিরই বকমফের। পরাবীধা নিয়মগুলি জীবনে কাজে লাগে না, ধবাবীধা নিয়ম কি জীবনে বেশি আছে ? যেগুলিকে অপবিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মানুষের আরোপ করা বিশেষণ মাত্র, উলটোটাও অন্যভাবে খাটিতে পারিত। মানুষ কী চায়, মানুষ কী করে এবং মানুষের কী চাওয়া উচিত আর মানুষের কী কবা উচিত, এর কি কোনো নির্দিষ্ট ফরমুলা আছে ? অমোর প্রস্তুত করা ফরমুলা চোখকান বুজিয়া অনুকরণ করা হয় বোকামি নয় গোঁয়ারতুমি। মেয়ে এবং পুত্রুষের মধ্যে যাবা সুবিধাবাদী, তারা বোকাও নয় গোঁয়ারও নয়। এই জন্য তারা আগে হিসাব-নিকাশ শেষ কবিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, দরকারমতো কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মন সিদ্ধান্তের বাঁধনে বাঁধা পড়িতে চায় না। শশধরের বাহুব বাঁধন রত্নাবলী মানিয়া লইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও সে কি স্বীকার কবিবে নারীজন্ম তাব সফল হইল অথবা মস্ত একটা ভুল সে করিয়া বসিয়াছে ঠিকের মাথায় ? দেহ অবশ্য তার অবশ হইয়া যাইবে, চোখ মেলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও হয়তো থাকিবে না, মনে প্রায় এই ধরনের একটা চরম সিদ্ধান্ত সমস্ত চিন্তাকে দখল করিতে চাহিবে যে জীবনের তার অতীতও ছিল না ভবিষ্যৎও থাকিবে না, তবু সে তখনও ভাবিতে থাকিবে . . . , শশধর যদি তাকে কামনা করে, নিজেকে সে কি তখন দান করিবে ? নিজেকে দান করা কি উচিত হইবে তার ?

আপনাবা বোধ হয় লক্ষ কবিয়াছেন যে, রত্নাবলীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিটা একটু অসাধারণ। সে যেন ইচ্ছা কবিয়া নিজেকে ধাঁধায় ফেলিয়া দেয়। সে যেন সব সময় সচেতন হইয়া থাকে যে, কী করিবে না কবিবে ঠিক সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।]

বিপিন আবার মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, আপনি বড়ো ছেলেমানুষ। বলিয়া নিছক বাহাদুরি করার জন্যই গম্ভীর মুখে হাত বাড়াইয়া রত্নাবলীর গালটা টিপিয়া দিল। রত্নাবলী মাথায় ঝাঁকি দিল, আধ হাত সর্বিয়া বসিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—আব কিছুই করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া রত্নাবলীর নিশ্চেষ্ট শাস্ত ভাবে খুশি হইয়া বিপিন বলিল, মাধুকে নিয়ে যাচ্ছি, মহেশবাবুব বাড়িতে রেখে আসব বলে। এখন কয়েকদিন ওইখানেই থাকবে, তারপর যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। ওর পক্ষে আশ্রমে থাকাও চলবে না, আমাদেরও ওকে রাখা চলবে না। আপনি বলছেন, আপনি সঙ্গে না গেলে ওকে আপনি যেতেই দেবেন না, আমি তাই ভাবলাম আপনিও বুঝি চিরদিনের মতো ওর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে চাইছেন। তাই সকলকে ডাকার কথা বলছিলাম। আপনি তো মাধবীর মতো চুপিচুপি আশ্রমে আসেননি, আপনি কেন চুপিচুপি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন—যেতে হলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই যাবেন।

বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল।

গাল টিপিয়া দেওয়ায় রত্নাবলী আধহাত তফাতে সরিয়া গিয়াছিল, এবার প্রায় হাতখানেক কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, মাধু চলে যাচ্ছে আশ্রম থেকে ?

সায় দিবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে যাওয়ায় বিপিনের মুখ প্রায় রত্নাবলীর মুখের সঙ্গে ঠেকিয়া গেল। তা হোক, তাতে দোষ নাই, গোপন কথার আদান-প্রদানের সময় মানুষের মানুষের মুখ কাছাকাছিই আসে। ভিতরের কৌতূহল রত্নাবলীর চোখ দুটিকে যেন সত্যসত্যই খানিকটা বাহিরের

দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। তেমনই চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, কী করেছে মাধু ? কার সঙ্গে করেছে ?

কী করবে ? কার সঙ্গে করবে ? ও তো আশ্রমে চিরকাল থাকবার জন্য আসেনি—কদিন বেড়িয়ে গেল, এইমাত্র।

আমার কাছে লুকোন কেন ? বলুন না ? পায়ে পড়ি, বলুন।

কী বলব ?

রত্নাবলী হতাশ হইয়া গেল। অভিমানে সরিয়া বসিল। কী করিয়াছে মাধবী ? আশ্রম হইতে তাড়িয়া দেওয়া হইতেছে এমন কী অপরাধ মেয়েটা করিয়াছে ! এতকাল সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারিল না ! জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তো মাধবীকে, মাধবী চলিয়া যাওয়ার আগে !

বসুন, ডেকে দিচ্ছি মাধবীকে।

আপনি বসুন, আমিই ডেকে আনছি।

ডাক শুনিয়া মাধবীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে !

এখনি যেতে হবে আপনার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, এখনি যেতে হবে।

চলুন তবে, যাই।

যাওয়ার সময় দাওয়ায় বসিয়া রত্নাবলী ক্ষীণস্বরে একবার মাধবীলতাকে ডাকিল। মাধবী সাড়া দিল না, ছুটিয়া গিয়া উম্মাদিনীর মতো সদানন্দের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া তাকে খুন করিয়া ফেলিবার জন্য তার ধৈর্য ধরিতেছিল না। বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে ডাকিয়া পাঠায় ! সে এত সস্তা, মানুষের কাছে তার মর্যাদা এত কম যে প্রকাশ্যভাবে বিপিনকে দিয়া সদানন্দ তাকে অভিসারে যাওয়ার হুকুম পাঠাইয়া দিতে পারে এমন অনায়াসে !

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলে, ওদিকে কোথায় চলেছ ?

মাধবীলতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ফপরদালালি করবেন না—আমি পথ চিনি।

শোনো, শোনো। দাঁড়াও।

পিছনে পিছনে খানিকটা প্রায় ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাব হাত ধবিয়া বিপিন তাকে দাঁড় করায়। মাধবী বলে, ও ! আপনি বুঝি পাওনা মিটিয়ে নেনবেন আগে ? শিগগির নিন, একটু তো ঘুমোতে হবে রাত্রে ?

বিপিন কোমলকণ্ঠে বলে, তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু ? কী বকছ পাগলের মতো ?

মাধবীলতাও কোমলকণ্ঠে বলে, মাথা খারাপ হবে না ? যা আরম্ভ কবে দিয়েছেন আপনারা, এতে মাথা ঠিক থাকে মানুষের ? এর চেয়ে কুমার সাহেবের মিসট্রেস হওয়াই আমার ভালো ছিল, কিছুদিন তো মজা করে নিতাম।

এখানটা ফাঁকা, কাছাকাছি দু-একটি মোটে গাছ আছে। এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো আশ্রমের কুটিরগুলির কয়েকটি মাত্র চোখে পড়ে আর এদিকে চোখে পড়ে সদানন্দের কুটির। জ্যোৎস্নালোকে কুটির ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙুলগুলি যদি তার পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া না যায় আর সে যদি মেয়েটার সর্বঙ্গে সন্নেহে আঙুল বুলাইয়া না দেয় পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে ! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনো একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না ? অসহ্য কোনো যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য ? অসম্ভব কোনো

কার্য সম্ভব করা চলে না ? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করছে বলো কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারও কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বলো।

কী উগ্র উদারতা বিপিনের ! এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে ? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁসফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, কেন কাঁদছ মাধু ? কেঁদো না। বলো না তুমি কী চাও ? অন্য কোথাও চলে যাবে ?

কোথায় যাব ? কাব কাছে যাব ?

যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমাব নামে বাড়ি কিনে দেব, ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব—

আপনার মিসট্রেস হয়ে থাকতে হবে তো ?

বিপিন একটু ভাবিল। হাতের আঙুল পাখির পালক নয় বলিয়া আপশোশ কবার সময় সদানন্দ যেমন ভুলিতে পারিতেছিল না যে মাধবীলতার ঠোঁটের নীচে দাঁত আছে আব আঙুলের উগায় নখ আছে আর রক্তমাংসের তলায় হাড় আছে, বিপিনও তেমনি এখন কেবলই ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল যে মাধবীলতা যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

‘বিপিন-চিন্তিয়া বিপিন তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কী বলো ?

মাধবীলতা চুপ। বিপিন সভ্যই মানুষ নয়।

যাক গে, ও সব কথা পবে হবে। এখন চলো তোমাকে মহেশবাবুব ওখানে রেখে আসি।

মহেশবাবুব ওখানে ?

হাঁ। এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিনের সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া নৌকাটিতে উঠিয়া বসিল। ছোটো ডিঙি নৌকা, ছাউনি নাই, হাল নাই, বসিবার ভালো ব্যবস্থাও নাই। তবু পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার চেয়ে নৌকায় মহেশ চৌধুরির বাড়ি যাওয়া অনেক সুবিধা। বিপিন নৌকা বাহিতে জানে।

সাত

কয়েকদিন জুরে ভুগিয়া মহেশ চৌধুরি সারিয়া উঠিলেন। এ কয়দিন কত লোক আসিয়া যে তার খবর জানিয়া গেল হিসাব হয় না। কেবল খবর জানা নয়, পায়ের ধুলা চাই। সদানন্দের আশ্রম জয় করিয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরিও পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন। লোকের ভিড়েই মহেশ চৌধুরির প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, মাধবীলতাকে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়া কথায় কথায় এই বিপদের কথাটা শুনিয়া বিপিন ভালো পরামর্শ দিয়া গেল। পরদিন হইতে শশধর সকলকে একটি করিয়া তুলসীপাতা বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল—উঠানের মস্ত তুলসীগাছটি দেখিতে দেখিতে দু-একদিনের মধ্যে হইয়া গেল প্রায় ন্যাড়া। যারা আসে তাদের প্রায় সকলেই চাষি-মজুর কামার-কুমোর শ্রেণির এবং বেশির ভাগই স্ত্রীলোক—তুলসীপাতা পাইয়াই তারা কৃতার্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

বিপিন প্রত্যেক দিন খবর জানিতে আসে। কার খবর জানিতে আসে, মহেশের অথবা মাধবীলতার, সেটা অবশ্য ঠিক বুঝা যায় না। যদিও মহেশের কাছেই সে বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ, আলাপ করে নানা বিষয়ে। আশ্রমে বিপিনের কাছে মহেশ বহুদিন ধরিয়া যে অবহেলা অপমান পাইয়া আসিতেছে সে কথা কেউ ভুলিতে পারিতেছিল না, এখন মহেশের খাতির দেখিয়া সকলে

অবাক হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কদমগাছের নীচেই কি মহেশের সব লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটয়াছে ? সদানন্দ কি সতাই এতকাল মহেশকে পরীক্ষা করিতেছিলেন, বিপিন এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে তারই ইজিতে মহেশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেছিল ? পরীক্ষায় মহেশ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার বিপিন বাড়ি আসিয়া তাব সঙ্গে ভাব করিয়া যাইতেছে, সেবার জন্য মাধবীলতাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে ?

বিপিন আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, আর মহেশ চৌধুরির ভক্তদেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দ্যাখে। কয়েক দিন পরে মহেশ চৌধুরির আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে থাকে, বিপিনের উৎসাহেও যেন ভাটা পড়িয়া যায়। প্রতিদিন আর তাকে বাগনাদায় দেখা যায় না। আসিলেও মহেশের কাছে সে বেশিক্ষণ বসে না।

মহেশ বাকুলভাবে মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করে, বিপিনবাবু যে আব আসেন না মা ?

মাধবীলতা বলে, কাজের মানুষ, নানা হাঙ্গামায় আছেন, সময় পান না।

বড়ো ভালো লোক। কী বুদ্ধি, কী কর্মশক্তি, কী তেজ, কী উৎসাহ—সবরকম গুণ আছে ভদ্রলোকের। এমন একটা মানুষের মতো মানুষ, জানো মা, আমি আব দেখিনি।

বিপিনের এ রকম উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা শুনিয়া মাধবীলতা হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। বুদ্ধি হয়তো আছে, বুদ্ধি থাকিলেই কি লোক ভালো হয় নাকি ? ওই স্তিমিত নিস্তেজ মানুষটার কর্মশক্তি, তেজ আর উৎসাহ !—যার মুখের চিরস্থায়ী বিষাদের ছাপ সংক্রামিত হইয়া মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে ?

এখানে মাধবীলতার ভালো লাগে না। মহেশ যে কদিন দক্ষিণেব ভিটাঘরটিতে দেড়শো বছরের পুবানো খাটে শইয়া জবেব ঘোরে ধুকিতে ধুকিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিত, ওবা আমার কাছে আসছে কেন ? প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দাও ওদের, সে কদিন সেবাব হাঙ্গামাস এক বকম কাটিয়া গিয়াছিল, মহেশ সুস্থ হইয়া উঠিবাব পর মাধবীলতার সব একধয়ে লাগে। গ্রামের মেয়েবা দু চাবজন করিয়া সকলেই প্রায় মাধবীলতাকে দেখিয়া গিয়াছে। পাড়াব কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পবিচয় হইয়াছে। কিন্তু এদের মাধবীলতার ভালো লাগে না। তাই নিজেও সে এদের কাউকে কাছে টানিবাব চেষ্টা করে নাই, নিজে হইতে তার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া ভাব জানাইবাব ভবসাও এদের হয় নাই। বেড়াইতে আসিয়া অভদ্র বিশ্বয়ের সঙ্গে এরা মাধবীলতাকে শূণ্য দেখিয়াই যায়। আশ্রমবাসিনী কুমারী সন্ন্যাসিনী (বয়স কত হইয়াছে ভগবান জানেন) সাধারণ বেশে আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করিতেছে, গায়ের মেয়েদের কাছে সে কতকটা স্বগচ্ছাত অর্পিব কল্পবীর মতো রহস্যময়ী জীব।

এখানে মানুষ নাই, বৈচিত্র্য নাই। স্নেহমমতা আদরযত্ন আছে, বিভূতির মা মেয়ের মতোই মাধবীলতাকে আপন করিয়া ফেলিতে চাইয়াছেন, কিন্তু কেবল মেয়ের মতো সব সময় একজনের আপন হইতে কি মানুষের ভালো লাগে ? আশ্রমের জীবনের পর কেমন নীরস একধয়ে মনে হয়। আশ্রম নির্জন, কিন্তু সে অনেক নরনারীর নির্জনতা ; আশ্রমের নিয়মে বীধা জীবন শান্ত, কিন্তু সে নিয়মও অসাধারণ, সে শাস্তিও অসামান্য। কী যেন ঘটিবাব অপেক্ষায় গাছপালায় ঘেরা আশ্রমের ছোটো ছোটো কুটিরগুলিতে প্রতি মুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকা যায়—মনে হয়, এই বৃষ্টি আশ্রমের গাভীরূপর্ণ শান্ত্যভাব চুবমার করিয়া প্রচণ্ড একটা অবরুদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে, এমন একটা কাণ্ড ঘটবে যা দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া নাচা যায়। এখানে কোনোদিন কোনো কিছু ঘটিবাব সম্ভাবনা নাই।

বিপিনকে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, উনি কী বললেন ?

কিছু বলেননি।

কিছুই না ? একেবারে কিছু না ?

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলে, কী বলবে ? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে। কী কুম্ফণে যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবোঁছিল মাধু।

মাধবী ভয় ও বিষ্ময়ে চুপ করিয়া থাকে। তাব জন্য বিপিন আব সদানন্দের মনান্তর হইয়া গেল ? জানালা দিয়া গ্রামের পথ দেখা যায়, বর্ষায় একেবারে শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও ভালো রকম মেঝামত হয় নাই। পথেব ধারে অবনী সমাদ্দারের বাড়িব সামনে একটি গোবু বাঁধা আছে। বোজাই বাঁধা থাকে, ঘাসপাতা খায় আর কয়েকদিনের বাছুরটিব গা চাটে। আজ বাছুরটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য না ? মাধবীলতা সেদিন যে সময় কথা পাড়িল সে চলিয়া আসায় সদানন্দের কী অবস্থা হইয়াছে, সেই দিন সেই সময় বাছুরটি উপাও হইয়া গিয়া গাড়িটিকে ব্যাকুল কবিয়া তুলিয়াছে।

আশ্রমের কীসে উন্নতি হবে সে চিন্তা ওব নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, আমার ওটা হল না, আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই। ওকে নিয়ে সত্যি মুশকিলে পড়েছি মাধু।

কেন, উনি বেশ লোক।

মাধবীলতার মুখে এ কথা শুনিয়া বিপিন প্রায় চমকইয়া যায়। নৌকায় উঠিবার আগে বাগেব মাথায় সদানন্দের কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়া, স্টেজে সবলা কোমলা বনবালাব অভিনয় করিয়া করিয়া হয়বান হইয়া গরম মেজাজে সাজঘরে ফিরিয়া আসা বেশার মতো ফুঁসিতে ফুঁসিতে মাধবীলতা যেসব কথা বলিয়াছিল বিপিন তার একটি শব্দও ভোলে নাই। জ্যাৎমালোকে দেখা মুখভঙ্গিও ভোলে নাই মাধবীলতাব। সদানন্দের অত্যাচার মেঘেটার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার চোখেব আড়ালে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিবার সুযোগ সদানন্দ পাইয়াছে ভাবিয়া সে বাগেব চেয়ে অনুতাপের জ্বালাতেই জ্বলিয়াছিল বেশ। সে বিপিন, আশ্রমেব কোথায় মাটিব নীচে কোন চাবাব বীজ হইতে অঙ্কুর মাথা তুলিতেছে এ খবর পর্যন্ত যে রাখে, তাকে ফাঁকি দিয়া সদানন্দ এত কষ্ট দিয়াছে মাধবীলতাকে। কী হইয়াছিল তাব ? আগেই কেন সে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে নাই ? কেন আশ্রমকে চলায় যাইবাব অনুমতি দিয়া নিজে গা এলহিয়া দিয়াছিল অসহ্য শিশুব মতো ?

সদানন্দের কুটিবের সামনে একটা কদমগাছেব নীচে মহেশ চৌধুরিব মহাযন্ত্র এবং মাধবীলতাব মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধেব সমাপ্তিব পব কয়েকটা দিন মেভারে কাটিয়াছিল ভাবিলে বিপিনেব এখন লজ্জা করে। শবীবটা একটু দুর্বল ছিল কিন্তু দাঁতের বাথা ছিল না। মায়ু ভোতা হইয়া থাকা উচিত ছিল বিপিনের, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে দু-তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানোই ছিল তাব পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে কী তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই সে ভোগ কবিয়াছে। বারবার কেবলই তাব মনে হইয়াছে, সে কি ভুল কবিয়াছে ? ছলে বলে কৌশলে দিগন্তের কোল হইতে তাব আদর্শের সফলতাকে আশ্রমেব এই মাটিতে টানিয়া আনিবার সাধনা কি তার ভ্রান্তিবিলাস মাত্র ? এ ভাবে কী বড়ো কিছু মানুষ করিতে পাবে না ? নিজেব জন্য সে কিছু চায় না, এইটুকুই কি তাব নৈতিক শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? ন্যায় অনায়াবের বিচাবেব চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে বড়ো ধবিয়া লইয়াছে বলিয়াই কি তার এত চেষ্টা আর আযোজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? মনে মনে নিজের দুঃখ কষ্ট ও ভাগ স্বীকারের হিসাব করিয়া বিপিন বড়ো দমিয়া গিয়াছে। কতটুকু লাভ হইয়াছে, কতটুকু সার্থকতা আসিয়াছে ? কোনদিকে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ? আশ্রম বড়ো হইয়াছে, আশ্রমেব সম্পত্তিও বাড়িয়াছে, লোকজনও বাড়িয়াছে, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। ভালো উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজিকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, সে সব একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন পরিকল্পনার অঙ্গ, আশ্রমেব জীবনে কেন সে সমস্তের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া ওঠে ? আর এদিকে মহেশ চৌধুরি, সরল নিরীহ বুদ্ধিহীন ভালোমানুষ মহেশ চৌধুরি, না চাহিয়া সে সকলের হৃদয় জয় কবিয়াছে, না জানিয়া নিজের দুঃখময় ব্যর্থ জীবনকে পর্যন্ত সার্থকতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। কী এমন মহাপুরুষ

মহেশ চৌধুরি যে তার পাগলামি পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করিয়া দেয় ? আর কী এমন অপরাধ বিপিন করিয়াছে যে, সকলে তাকে কেবল ফাঁকিই দেয়, সদানন্দ হইতে মাধবীলতা পর্যন্ত ? এইসব ভাবিতে ভাবিতে বিপিন মড়ার মতো বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াছে—অন্য মানুষ সে অবস্থায় ছটফট করে। সেই সময়েই বিপিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল, মহেশ চৌধুরির সঙ্গে ভাব করিয়া লোকটাকে একটু ভালোভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে বিশেষ উৎসাহ তার ছিল না। তারপব ধীরে ধীরে মহেশ চৌধুরিকে কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর আশ্রমের পরিসর বাড়ানো সম্ভব নয়, সম্প্রতি যে আমবাগানটা পাওয়া গিয়াছে তাই লইয়াই আপাতত সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং রাজাসাহেবের ভয়ে মহেশ চৌধুরিকে এড়াইয়া চলিবার আব তো কোনো কাবণ নাই ! আশ্রমে অর্থ সাহায্য করাও রাজাসাহেব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিছুদিন আর পাওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতে আবার যদি রাজাসাহেবের কাছে কিছু আদায় করা সম্ভব মনে হয়, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এদিকে, যাদের চাষাভূসো মানুষ বলে, জনসাধারণ নামে আশ্রমকে যারা ঘিরিয়া আছে গ্রাম আর পল্লিতে, তাদের সঙ্গে আশ্রমের একটু যোগাযোগ ঘটানো দরকার। ওদের বাদ দিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ওদের সঙ্গে এখন যে সংযোগ আছে আশ্রমের, সে না থাকাব মতো। কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের নরনারী আশ্রমে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে এবং সদানন্দকে প্রণাম করিতে আসে, প্রণামান্তে কিছু প্রণামিও দিয়া যায়—কিন্তু সে আর কজন মানুষ, সে প্রণামি আর কত ! তিন দিনের পথ হাঁটাইয়া অনেক দূরের গ্রাম হইতে মানুষকে যদি আশ্রমে টানিয়া আনিতে হয় আর এক একদিনের প্রণামির পরিমাণ দেবিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশেব সর্বত্র আশ্রমের শাখা খুলিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেওয়া সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে অনাকিছু করা চাই, কেবল সদানন্দকে দিয়া কাজ চলিবে না।

মহেশ চৌধুরিকে এরা পছন্দ করে—এইসব সাধারণ মানুষগুলি।

মানুষটাও ভালো মহেশ চৌধুরি।

শিশুর মতো সরল।

কয়েকদিন আসা-যাওয়া মেলামেশা করিয়া বিপিন কিন্তু একটু ভড়কাইয়া গেল। মহেশ চৌধুরির আসল রূপটা সে আর খুঁজিয়া পায় না। ভালো মানুষ, শিশুর মতো সরল, কিন্তু জোর কই ? আশ্রমের কদমতলায় তার যে মনের জোরের পরিচয় বিপিনকে পর্যন্ত কাবু করিয়া কয়েকদিন আনমনা করিয়া রাখিয়াছিল ? ছেলের কথা বলে, ঘরের কথা বলে, নিজের কথা বলে আর এইসব কথার মধ্যে ফোড়ন দেয় ভগবানের কথার—শান্তি চাই মহেশের, শান্তি ! অনেক দুঃখ পাইয়াছে মহেশ, সে জন্য কোনো দুঃখ নাই, এবার একটু শান্তি না পাইলে যে শেষ জীবনটাও মন দিয়া ভগবানকে ডাকা হয় না মহেশের !

ভগবানকে ডাকবার জন্য আমরা আশ্রম করিনি।

মহেশ চৌধুরি কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলে, এখনও আমার সঙ্গে ছলনা করবেন বিপিনবাবু ? ভগবানকে ডাকার জন্য ছাড়া আশ্রম হয় ! তবে ভগবানকে ডাকার সুবিধের জন্যে অন্যকিছু যদি করেন—সে সবও ভগবানকে ডাকারই অঙ্গ।

আপনি তো প্রভুর বাণী শোনেন ?

শুনি বইকী।

∴

উনি কি কোনোদিন বলেছেন, আশ্রমে যাঁরা আছেন তাঁদের কাজ হল ভগবানকে ডাকা ?

বলেন বইকী—সব সময়েই বলেন। আমরা সবাই পাপী তো বিপিনবাবু ? প্রশ্ন শুনিয়া বিপিন গুম খাইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরি সায় না পাইয়াও বলে, মহাপাপী আমরা। আমাদের কী ক্ষমতা আছে নিজে থেকে ভগবানকে ডাকবাব ? তাই যদি পারতাম বিপিনবাবু, মনে আমার এমন অশান্তি কেন—সকলের মনে অশান্তি কেন ! প্রভু আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কী কবলে ভগবানকে ডাকবাব ক্ষমতা হয়, কী করলে আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি। কাণ্ডারী একমাত্র ভগবান, কিন্তু গুরুদেবের চরণতরীই ভরসা—। তর্কেব কথা নয়, তর্ক বিপিন করে না, কথায় কথা তুলিয়া মানুষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। অন্য সব দিক দিয়া সে হতাশ হইয়া যায়, একটিমাত্র ভবসা থাকে মহেশের নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা। নিজে যা জানিয়াছে তার বেশি কিছু জানিতে বা বুঝিতে চায় না, সদানন্দের কথা হোক, শাস্ত্রের বাক্য হোক, তার নিজের ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা। এদিক দিয়া মহেশ ভাঙিবে কিন্তু মচকাইবে না।

এ রকম মানুষ দিয়া বিপিনের কাজ চলিবে কী ?

আচ্ছা, প্রভু যদি আপনাকে কোনো অন্যায় আদেশ দেন, সে আদেশ আপনি পালন করবেন ? প্রভু অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না।

মনে করুন দিলেন—

ও রকম ছেলেমানুষি অসম্ভব কথা মনে কবে কী লাভ হবে বলুন ?

বিপিনের ধৈর্য অসীম।

ওঁর আদেশ অন্যায় আমি তা বলছি না। ধরুন, উনি ঠিক মতো আদেশই দিয়েছেন, আপনার মনে হং; আদেশটা সঙ্গত নয় ; তখন আপনি কী করবেন ?

মহেশ নিশ্চিতভাবে বলে, আদেশ অন্যায় বলে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।

আদেশটা পালন কববেন তো ?

উনি যদি আমার মনের ধাঁধা মিটিয়ে দিয়ে আদেশ পালন কবতে বলেন, তবে নিশ্চয় করব।

আব যদি মনের ধাঁধা না মিটিয়ে শুধু আদেশ পালন কবতে বলেন ?

মহেশ হাসিয়া বলে, যান মশায়, আপনার আজ মাথার ঠিক নেই। ও রকম উনি কখনও বলতে পারেন ?

যদি বলেন ?

আপনি আবার সেই অসম্ভব কল্পনার মধ্যে যাচ্ছেন।

বিপিনের ধৈর্য সত্যি অসীম।

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলেন ? এতদিন আপনাকে সে রকম পরীক্ষা করছিলেন না, এই বকম কোনো পরীক্ষা কবার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আপনাকে অন্যায় আদেশ পালন করতে বলেন ?

পরীক্ষার জন্য ? আবও পরীক্ষা কববেন ? মহেশের মুখ চোখের পলকে শূকাইয়া যায়। ভীত সম্ভ্রান্ত শিশুর মতো অসহায় চোখ মেলিয়া সে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সদানন্দের পরীক্ষায় পাস করিয়াছে কী ফেল করিয়াছে :ব্রাজও মহেশ চৌধুরি ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই, শুধু জানিয়াছে যে সদানন্দ তাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, জানিয়া এই সৌভাগ্যেই সর্বদা ভগমগ হইয়া আছে। পরীক্ষার কথা মনে হইলেই তার মুখ শূকাইয়া যায়।

বিপিনের পিছনে বিভূতির মা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়াছে। দুধটা বেশি গরম ছিল, এমনিভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকতেও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হইতে কোনো বাধা হইতেছে না তাই এতক্ষণ দুজনের অপবৃপ আলাপে বাধা দেয় নাই। এবার বলিল, বিপিনবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনি কথায় পারবেন না। গুরুদেবের সমস্ত আদেশ উনি চোখ কান বুজে মেনে চলবেন—ভাববেন না।

তবু বিপিনের ভাবনার শেষ হয় না। এমন সমস্যায় সে আর কখনও পড়ে নাই। একটা মানুষকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে যে এত ভাবিতে হয় বিপিনের সে ধারণা ছিল না। আশ্রমে যদি স্থান দেওয়া হয় মহেশকে, কাজে কি তার লাগিবে মহেশ ?

মাধবীলতাকে পর্যন্ত অনামনে একসময় সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, মহেশবাবু লোক কেমন মাধু ?

মাধবীলতা সংক্ষেপে বলে, ভালো নয়।

সদানন্দকে মাধবীলতা ভালো লোক বলিয়া প্রশংসা কবিয়াছিল। মনে পড়াতেও বিপিনের হাসি আসিল না। মাধবীলতা অন্য মানদণ্ড দিয়া বিচার করিতেছে—ভালো শব্দটায়ও অনেক রকম মানে আছে।

গভীরমুখে সে জিজ্ঞাসা কবে, আশ্রমে ফিরে যাবে মাধু ?

যাব।

কী কববে আশ্রমে গিয়ে ?

এ প্রশ্নের জবাব মাধবীলতা দিতে পারিল না।

আট

বিপিন ভাবিতেছিল, মাধবীলতাকে প্রথমে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশকেও আশ্রমে আসিয়া বাস কবিতে বলিবে কিনা ঠিক করিবে। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিতে লাগিল। সদানন্দের নাগালের মধ্যে আবার মাধবীলতাকে আনিয়া ফেলিতে বিপিন আব সময়ই পায় না। নিজেই সে বুঝিতে পারে না মাধবীলতাকে ফিরাইয়া আনিবে ঠিক কবিয়াও মত্শেষে ওখানে মেয়েটাকে কেন ফেলিয়া রাখিয়াছে। এবাব অবশ্য সে মাধবীলতার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা কবিবে, নিজেও সতর্ক থাকিবে, তবু যেন ভয় হয়।

সদানন্দ বড়ো ভয়ানক মানুষ। (বিপিনের মতে)

সদানন্দের মানুষ বশ করাব যে ক্ষমতাকে অসামান্য গুণ মনে করিয়া বিপিন এতদিন আশ্রমেব কাজে লাগাইয়াছে, আজ সেই ক্ষমতাকে অনিষ্টকর ভয়ানক কিছু বলিয়া গণ্য কবিতে বিপিনেব দ্বিধা হয় না। বিজ্ঞানের সুবিধাভোগীবা যেভাবে বিজ্ঞানকে অভিশাপ দেয়, সদানন্দকেও বিপিন আজকাল তেমনইভাবে কাজ ফুরানো পাজির দলে ফেলিয়াছে। কেবল মাধবীলতার জন্য এ বিবাগ নয়। সদানন্দের কাজ প্রকৃতপক্ষে ফুরায় নাই, মনে হইয়াছিল সদানন্দকে বাদ দিয়াও আশ্রম চালানো যাইবে কিন্তু কল্পনাটা কার্যে পরিণত করিবার নামেই নানারকম আশঙ্কা মনে জাগায় আপনা হইতেই বিপিন টের পাইয়াছে যে সদানন্দকে সে বিদায় দিতে চায় বটে কিন্তু এখনও সেটা সম্ভব নয়।

যে কোনো বুদ্ধিমান উৎসাহী লোক সদানন্দকে সামনে দাঁড় করাইয়া এ রকম একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিতে পারিবে—সদানন্দকে বিদায় করার পক্ষে এই এখন সব চেয়ে বড়ো বাধা। সদানন্দ শুধু চলিয়া গেলে আরও বেশি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া আশ্রমকে সে চালাইয়া নিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে সদানন্দ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে পারিবে না। হয়তো পারিবে, কোনো বিষয়েই নিজেকে বিপিন অক্ষম ভাবিতে পারিবে না, কিন্তু সাধ করিয়া সে হাঙ্গামা টানিয়া আনিবার সাহস বিপিনের নাই।

বিপিনের সাহস কি কম ? বিপিন কি ভীবু ?

মাধবীলতা তাই বলে। বলে, বিপিনবাবু ? উনি অপদার্থ ভীবু কাপুরুষ—

বলে মহেশকে। প্রাণ খুলিয়া বিপিনের নিন্দা করিতে পারে। মহেশ চৌধুরির উপর বিরজিতা তার এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, লোকটাকে দেখিলেই গায়ে যেন আজকাল তাপ জ্বব আসে। কিছুদিন আগে মাধবীলতা বিপিনকে বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরি লোক ভালো নয়। তখন বিপিনের সাহচর্য সে সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল মহেশ চৌধুরির একসুরে বাধা মনোবৈপার একযোগে ঝংকনবগুলি একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় বিপিনের মধ্যেও হঠাৎ সে কিছু কিছু বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনের কাছে আর তাই মহেশ চৌধুরির সম্বন্ধে কোনো রকম মন্তব্য করে না, মহেশ চৌধুরির কাছে বিপিনকে বিশেষণে পব বিশেষণে অভিনন্দিত কবিয়া চলে—চালবাজ, মিথ্যুক, লোভী, অসংযত প্রভৃতি কত সংজ্ঞাই যে বিপিনকে সে দেয়।

বিপিনের প্রশংসায় মহেশ কিন্তু পঞ্চমুখ। কারও সম্বন্ধে মহেশ কখনও কোনো কাবণেই মত বদলায় না—অন্তত স্বীকার করে না যে নিন্দা প্রশংসায় কারও সম্বন্ধে তাব ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। নিন্দা সে জগতে কারও করে না, একবার যাব সে গুণগান করিয়াছে চিরকাল সমান উৎসাহের সঙ্গে তার সেই গুণকীর্তনই কবিয়া যায়।

মাধবীলতার মুখে বিপিনের বিশেষণগুলি শুনিয়া সে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিতে বসে যে, মাধবীলতা ভুল করিয়াছে, ও সব বিশেষণ বিপিনের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না। বিপিন মহান, উদার, আত্মত্যাগী মহাপুত্র—চাল বিপিনের নাই, মিথ্যা সে কখনও বলে না, লোভী সে নয়, সংযমের তাব তুলনা নাই। বিপিনের ভীৰুতার অপবাদটিরও মহেশ প্রতিবাদ করে।

এদা নাড়িয়া হাসিয়া বলে, বিপিনবাবু ভীৰু কাপুত্র ? কী যে তুমি বলো মা। ওঁর মতো বৃকের পাটা কটা মানুষের থাকে ?

মাধবীলতা বাগিয়া বলে, কী যে দেখেছেন আপনি বিপিনবাবুর মধ্যে। উনি যদি ভীৰু কাপুত্র নন, কে তবে ভীৰু কাপুত্র ? শুনুন বলি তবে। আশ্রমের ক্ষতি করবেন ভয়ে আপনাকে উনি আশ্রমে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

বাগের মাথায় ভিতরের মস্ত বড়ো কথা যেন ফাঁস করিয়া দিয়াছে এমনই গর্বভাব অনুতাপের ভঙ্গিতে মাধবীলতা একদৃষ্টে মহেশ চৌধুরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মহেশ চৌধুরি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়। মনে হয়, ভিতরের আসল কথাটা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ চটিয়াই গিয়াছে ! কিন্তু কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যায় এত সহজে খেইহারা হইবার মানুষ সে নয়।

ভয় তো বিপিনবাবুর মিথো নয় মা। আমাকে আশ্রমে ঠাই দিলে আশ্রমের ক্ষতির আশঙ্কা আছে বইকী। আমি হলাম মহাপাপী, আমার সংস্পর্শে—

বিপিনের ভীৰুতাব প্রমাণটি ফাঁসিয়া যায়। চালের উপবেই বিপিন চলে এ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদাহরণ দাখিল কবিত্তে গিয়া বিপিনের চালবাজের একটি দৃষ্টান্তের কথাও মাধবীলতা আগে এতদিন অনেক চেষ্টাতেও মনে করিতে পাবে নাই। বিপিনের ভীৰুতার কয়েকটি জোবালো দৃষ্টান্ত আজ সে কোনো রকমেই স্মরণ করিতে পাবে না। বিপিন ভীৰু সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে কোথায় সে ভীৰুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ?

ভাবিতে গেলে সতাই বড়ো বিষয় বোধ হয়। বিপিনের কি তবে দোষ বলিয়া কিছুই নাই ? অভাব কেবল তার গুণের ? সদগুণ একেবারে নাই বলিয়াই লোকটার চালচলন এমন নিন্দনীয় মনে হয় ? সংসারে মানুষ হয় ভালোমন্দ মেশানো, কারও মধ্যে ভালো থাকে বেশি কারও মধ্যে কম, কিন্তু বিপিনের মধ্যে ভালোর নামগন্ধও নাই। তাই কি বিপিনকে মনে হয় খারাপ লোক, যদিও তার মধ্যে মন্দের ভাগটাও খুঁজিয়া মেলে না ? কথাটা যেন দাঁড়াইয়া যায় ধীধায়—ভালোও নাই মন্দও নাই, কী তবে আছে বিপিনের মধ্যে ? কীসের মাপকাঠিতে মানুষ তাকে মানুষ হিসাবে বিচার করিবে ? তাকে কি ধরিয়া নিতে হইবে নিন্দা প্রশংসার অতীত মহামানব বলিয়া ?

বিপিন মহামানব ! ভাবিলেও মাধবীলতার হাসি আসে। কিন্তু ধারণা দিয়া—আপনা হইতে মনের মধ্যে যে সব ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণাগুলি দিয়া—বিপিনের বিচার না করিলে, বিপিনের দোষণ নিরপেক্ষভাবে ওজন করিতে বলিলে, বিপিন সত্যই পরিণত হয় মহামানব।

নিজের সমস্যাগুলি নিয়া অত্যন্ত বিরতভাবে বিপিনের দিন কাটিতেছে, মাধবীলতার খবর নেওয়ার সময়ও বিশেষ পাইতেছে না, এমন সময় বিভূতি একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মহেশের অসুখ উপলক্ষে তাকে বাড়ি ফিরিতে দেওয়া হইয়াছে। না বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিবে না, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে।

ছেলের চেহারা দেখিয়া বিভূতির মা কাঁদিয়াই আকুল। মহেশ বলিল, কাঁদছ কেন ? পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না ?

বিভূতি বলিল, খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও, আর কিছু নয়।

পরদিন ভোরবেলা মহেশ ছেলেকে নিয়া সদানন্দের চরণ বন্দনা করিতে বাহির হইল। চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে আশ্রমে যাইতেছে এ কথা অবশ্য বিভূতিকে জানাইল না, শুধু বলিল, আমাদের একবার আশ্রম থেকে ঘুরিয়ে আনবি চল তো।

কী হবে আশ্রমে গিয়ে ? অ্যাঙ্কিন পরে এলাম, গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দেখাটেকা করি ?

পবে দেখা করিস। আগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসবি চল।

কিন্তু বিভূতির কাছে আশ্রমের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। গ্রামের চেনা মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই মনটা তার ছটফট করিতেছিল। তার আসিবার খবরটা সে আসিয়া পৌঁছিবাব অনেক আগেই গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু কাল কেউ তাকে দেখিতে আসে নাই বলিয়া বিভূতি একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তার সংস্পর্শে আসিতে কয়েকজনের ভয় হওয়া সম্ভব, অন্তত ভয় ভাঙিতে কিছুদিন সময় লাগিবে, কিন্তু চোবা গাইয়ের সঙ্গে কপিলা গাইয়ের বাঁধা পড়িবাব আতঙ্কটা কি সকলের মধ্যেই এত বেশি প্রচণ্ড যে একজন তার খবর নিতেও আসিল না ?

না আসুক, বিভূতি নিজেই সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া ভয় ভাঙাইয়া দিয়া আসিবে। আশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই ইতস্তত করিতে থাকে।

আশ্রমে যাওয়ার নামে মাধবীলতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, তাই চলুন, আশ্রম দেখে আসবেন।

বিভূতি হাসিয়া বলে, আশ্রম দেখা কী আব আমার বাকি আছে, ঢের দেখেছি।

সে আশ্রম আর নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

বিভূতির জেলে যাওয়ার আগে সদানন্দের আশ্রম কেমন ছিল এবং তারপর আশ্রমের কী পরিবর্তন হইয়াছে মাধবীলতার জানিবার কথা নয়, এটা তার শোনা কথা। মাধবীলতার উৎসাহ দেখিয়া বিভূতি আর আপত্তি করিল না, তিনজনে আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গেল—মহেশ, মাধবীলতা আর বিভূতি। বিভূতির মা গেল না, বলিল, আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো।

বাড়ির সামনে কাঁচাপথ ধরিয়া তিনজনে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে, শশধর আসিয়া জুটিল। আশ্রমে যাওয়ার একটা সুযোগও শশধর ত্যাগ করে না।

মহেশ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁটিতে পারবে তো মা ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলিল, ডামাকে জিজ্ঞেস না করে বরং আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।

মহেশ নিশ্চাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা, দুর্গা। সত্যি ওর চেহারাটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখা হইয়া গেল বত্সাবলীৰ সঙ্গে। মাধবীলতাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, বেঁচে আছিস ?

মহেশ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মা ?

কাছেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল, কদিন আগে গাছটা কাটা হইয়াছে। বিভূতি গুঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া সে আর নড়িবে না।

মাধবীলতা বলিল, কাঠপাঁপড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে কিন্তু।

বিভূতি বলিল, দিক, গোখাবো সাপ কামড়ালেও এখন আমি নড়ছি না।

তখন সেইখানে কাঠের গুঁড়িতে বসিয়া সকলে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। শীতের সকালের প্রথম মিষ্টি রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল সকলের গায়ে। আরামে এমন জমিয়া উঠিল আলাপ যে মনে হইতে লাগিল, সদানন্দের চরণ বন্দনার কথাটা মহেশও ভুলিয়া গিয়াছে ! কিছুক্ষণ পরে কুটিব হইতে বাহির হইয়া তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময় স্বয়ং সদানন্দকেও কেউ দেখিতে পাইল না। খেয়াল হইল সদানন্দ যখন সামনে আসিয়া রোদ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে প্রণাম করিল মহেশ, তারপর মামার অনুকরণে শশধর। রত্নাবলী প্রণাম করায় মাধবীলতাও টিপ করিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া দিল।

সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ মাধু ?

মাধবী বলিল, ভালোই আছি।

মহেশ বিভূতিকে বলিল, ঐকে প্রণাম করো।

আগেব কথা সদানন্দের মনে ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, থাক, থাক।

মহেশ জোর দিয়া আবার বলিল, প্রণাম করো বিভূতি, ঐর আশীর্বাদে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি উঠে নাই। বসিয়া থাকিয়াই সে দু-হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কাব, ভালো আছেন ? অনেকদিন পরে দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ গবর্নমেন্টকেও টলিয়ে দিতে পারে তা তো জানতাম না !

সদানন্দ শাস্তভাবে বলিল, আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।

বিভূতি আবও বেশি শাস্তভাবে বলিল, ভগবানের কথা বাদ দিন, তিনি তো সব সময়েই টলছেন মাতালের মতো! টাল সামলাতে প্রাণ বেবোচ্ছে আমাদের।

মাধবীলতা চোখ বড়ো বড়ো কবিয়া বিভূতিব দিকে চাহিয়া থাকে। রত্নাবলীব সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক কবে। অস্থির হইয়া ওঠে মহেশ। কী কবিবে ভাবিয়া না পাইয়াই যেন প্রথম দিকে ব্যাকুলভাবে শূণ্ণ বলিয়া চলে, 'আহা', 'ওকি' আব 'ছি ছি'। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া, সোজা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে, বিভূতি !

বসা অবস্থাতেই সোজা আর শক্ত হইয়া বিভূতি বলে, কেন ?

পায়ে হাত দিয়ে ঐকে প্রণাম করো, নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।

ঐকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না বাবা। ক্ষমা চাওয়ার মতো অনায়াস কথা কিছু বলিনি।

ঐকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি, আমার ছেলে তুই, ঐকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় না ? যা মনে এল বলে বসলি মুখের ওপর, তবু তোর কথা বলা হল না ?

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

করবি না প্রণাম ?

না।

এবার প্রশান্তকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, মহেশ, কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করে দিলে তুমি ?

ছেলেমানুষি প্রভু ?

তুমি কী ভাব ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি ?

তা ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক আপনার তাতে কী আসবে যাবে—সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু ?

সদানন্দ অভয় দিয়া বলিল, ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রি করি না মহেশ, আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যাবসা নয়, ভুলে যাও কেন ? ছেলেমানুষের কথায় যদি আমি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব।

মহেশ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল, তা কী জানি না প্রভু ? আপনি দেবতা, আপনার কি বাগদেহ আছে ? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।

অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভালো, মহেশ।

না প্রভু। প্রণামকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে। বিভূতি, প্রণাম করো একে।

বিভূতি নীরবে মাথা নাড়িল।

মহেশ আবার বলিল, বিভূতি প্রণাম করো। এই দণ্ডে যদি প্রণাম না করো একে, আমি যেমন আছি তেমনিভাবে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব, কোনোদিন আবার ফিরব না।

বিভূতি শুকনো মুখে কোনো রকমে বলিল, আমি পারব না বাবা।

মাধবীলতার সব কথাতেই ফোড়ন দেওয়া চাই। পিতার আদেশ আর মিনতি সেখানে ব্যর্থ হইয়া গেল, যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত কাজে লাগিল না, সেখানে কাতরকণ্ঠে বিভূতিকে অনুরোধ না জানাইয়া সে পাবিল না, আহা, এমন করে বলছেন সবাই, কবুন না প্রণাম একবারটি ?

এমন সময় আসিল বিপিন।

কারও দিকে বিপিন চাহিয়াও দেখিল না। সোজাসুজি মাধবীলতার কৈফিয়ত দাবি করিয়া বলিল, আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এলে যে মাধু।

বিপিনের মুখ দেখিয়া আর গলার আওয়াজ শুনিয়া মাধবীলতার মুখ দিয়া কথা বাহিব হইল না। মহেশ বলিল, আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।

বিপিন তীব্রস্বরে ধমক দিয়া বলিল, চূপ কবুন, আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা কবিনি।

প্রকাশ্যভাবে কেউ কোনোদিন বিপিনকে উঁচু গলায় কথা বলিতে শোনে নাই—বিশেষত সদানন্দের সামনে।

সকালবেলাই এমন একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনে মনে সকলেই একটা শঙ্কা-জড়িত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। বিভূতি সদানন্দকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করায় যে খাপছাড়া কাণ্ড ঘটবার উপক্রম হইয়াছিল, বিপিনের আবির্ভাবে এখনকার মতো সেটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য ? মহেশ চৌধুরি ছাড়িবার পাত্র নয়। সে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, বিভূতি সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম না করিলে যেদিকে দু-চোখ যায় চলিয়া যাইবে। বিপিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই সে আবার ছেলেকে নিয়া পড়িবে।

কিন্তু কী বোঝাপড়া হইবে বিপিনের সঙ্গে ? মহেশ চৌধুরি কি চূপ করিয়া থাকিবে বিপিনের ধমক সহ্য করিয়া ? ধমকটা সদানন্দ দিলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিত, সদানন্দ এমন প্রচণ্ড শব্দে ধমক দিলে এতটা খারাপ শোনাইত না। মহেশ চৌধুরির মতো ভক্তকে ধমক দিবার অধিকার সদানন্দের মতো মহাপুরুষের থাকে এবং আগেও অনেকবার অনেক ছুতায় মহেশ চৌধুরিকে সে

অপমান করিয়াছে। সদানন্দের অপমান অনেকটা গা-সহা হইয়া আসিয়াছে মহেশ চৌধুরির। কিন্তু বিপিনের অপমান সে সহ্য করিবে কেন ? দুজনে যদি এখন কলহ বাড়িয়া যায় !

মহেশ চৌধুরি কী বলে শুনিলে শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরির মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। বিপিনের ধমকটা তার কানে গিয়াছে কী না এ বিষয়েও যেন কেমন সন্দেহ জাগে ! চাহিয়া সে থাকে মাধবীলতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, এতদিনেব ঘনিষ্ঠ পবিচয়ের পর তার একটা নতুন রূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনায় শশধর ও সদানন্দের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরির মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া আসে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া উদাস কণ্ঠে সে বলে, মাধু আশ্রমে আসতে পাবে না হুকুম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না বিপিনবাবু !

মহেশ চৌধুরির ভঙ্গিটাই মারাত্মক। তার উপর হুকুম শব্দটা সকলের কানে যেন বিধিয়া যায়।

মাধবীলতার অপরাধক্রিষ্ট মুখের স্নানিমায় স্নায়বিক মুঢ়তার ভাবটাই এতক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল, তবে মহেশ চৌধুরি ছাড়া সেটা কেউ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনে কে আর ও ভাবে তবুণী মেয়ের মুখ দেখিতে শেখে ? সোজাসৃজি ভীৰুতা আর কোমলতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়ায় কত ভালো লাগিতেছিল সকলেব, কেমন দরদ সকলে বোধ করিতেছিল মেয়েটার জন্য ! কিন্তু ও রকম বর্বরের মতো মায়া করা মহেশ চৌধুরিব ধর্ম নয়, ও বকম সংকীর্ণ স্বাখপবতা তার নাই। মানুষের এই স্বগত রসানন্দরূপী পিপাসা-সৃষ্টির আগ্রহ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য ছোটো ছোটো মুক্তির মধ্যে মহেশ শক্তি সঞ্চয় কবিয়াছে। মাধবীলতার ভীৰু কোমল কাঁদো কাঁদো মুখখানা দেখিয়া মহেশ চৌধুরি ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিত তার ভয় বা দুঃখ হয় নাই, আকস্মিক স্নায়বিক উত্তেজনায় সে একটু দিশেহারা হইয়া গিয়াছে ? খোঁচা দিয়া তাব আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার এবং তার অববুদ্ধ তেজকে মুক্তি দিবার বুদ্ধি বা সাহস আর কার হইত ? সোনালি রোদের মতোই মাধবীলতার মুখে লালিমার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিয়া মহেশ আবাব বলে, এবাবকার মতো ওকে মাপ করুন বিপিনবাবু। আপনি ওকে বাবণ করেছেন জানলে—বিপিনের আদেশ অমান্য করায় মাধবীলতার যে অকথা অপবোধ হইয়াছে তার বিরটিত্ব অনুভব কবিয়া মহেশ চৌধুরি নিজেই যেন সংকুচিত হইয়া যায়, কোনো রকমে এবাবকার মতো মেয়েটাকে বিপিনের ক্ষমা পাওয়াইয়া দিবার ব্যাকুলতায় যেন দিশেহারা হইয়া যায়। মাধবীলতার হইয়া সে যেন বিপিনেব পায়ে ধরিয়া বসিবে।

এবার মাধবীলতা ফাঁস করিয়া উঠে, বাবণ করেছেন মানে ? উনি বাবণ করবার কে ? বেশ করেছে আমি আশ্রমে এসেছি।

বিপিন বলে, আশ্রমটা বেড়াবাব জায়গা নয় মাধু।

মাধবীলতা বাঙ্গ কবিয়া বলে, কী করবেন, মারবেন ?

সদানন্দ বলে, আহা, কী আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা ?

সে কথা কানে না তুলিয়া বিপিন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, ছেলেমানুষি কোরো না মাধু। আমার সঙ্গে এসো।

মহেশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া বলে, যাও মা, যাও। বিপিনবাবুর সঙ্গে যাও।

মহেশ চৌধুরি ফোড়ন না দিলে হয়তো মাধবীলতার উদ্ধত ভাবটা ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিত। বিপিনের সংযমহারা রাগ দেখিতে ভিতরে ভিতরে তাব যেন কেমন ভালো লাগিতেছিল। সেদিন রাত্রের কথা মাধবীলতার মনে পড়িয়া গিয়াছে, বিপিন যখন তাকে মহেশ চৌধুরির বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রের স্মৃতি তুলিবার নয়, মাধবীলতা তুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ তার

খেয়াল হইয়াছে, সে রাত্রে বিপিন তার সঙ্গে যে আশ্চর্য ব্যবহার করিয়াছিল, তার মাথাটা বৃকে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যেখানে যাইতে চায় পাঠাইয়া দিবে, তাকে বাড়ি কিনিয়া দিবে, তার নামে ব্যাঙ্ক টাকা রাখিবে, মাঝখানে কয়েকদিনের ছেদ দিয়া আজ দিনের আলোয় বিপিন যেন সেই ব্যবহারেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। তফাত কেবল এইটুকু যে, মাঝখানের সময়টাতে সে যেন সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে বিপিনের হইয়া গিয়াছে। বিপিনের রাগ আর ধমক দিয়া জোর গলায় কথা বলার মধ্যে পর্যন্ত মাধবীলতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে বিপিন ভেগব খাটাইতেছে আত্মীয়তার, অন্য কিছু নয়। সে যেন বিপিনের মেয়ে বা বউ বা ওইরকম একটা কিছু।

কিন্তু মহেশ চৌধুরি ফোড়ন কাটায় এতগুলি মানুষের সামনে বিপিনের ব্যবহারে মেজাজটা তার চড়িয়াই যাইতে থাকে। সকলের সামনে এ ভাবে শাসন করিতে গেলে মেয়ে বা বউ চটিয়া যায় বইকী।

মাধবীলতা বিভূতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পিছন ফিরিয়া।

চলুন আমরা ফিরে যাই বিভূতিবাবু। যাবেন ?

আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু ?—সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, যাও মা যাও, প্রভুর মন্দিবে একবার যাও।

মাধবীলতা জবাবও দিল না।

বিভূতি এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাধবীলতাকে সঙ্গে করিয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার উপক্রম করে, সকলে দাঁড়াইয়া থাকে কাঠের পুতুলের মতো। বিভূতি অস্বীকার করিয়াছে প্রণাম করিতে, মাধবীলতা ফিরিয়া চলিল আদেশ অমান্য করিয়া ! চাবিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে নাকি সদানন্দের বিবুদ্ধে ? আশ্রমে দাঁড়াইয়া সদানন্দকে এ ভাবে অপমান আর অমান্য করা ! দাঁতের বদলে রক্তাবলীর চোখ দুটি চকমক করে। শশধর বোকার মতো হাঁ করিয়া থাকে। কী কবিবে বুঝিতে না পারিয়া বিপিন অসহায় ক্রোধ দমন করার জন্য একটা বিড়ি ধবায়। সদানন্দের ভীতিকর গাণ্ডীর্থ ঘনীভূত হইয়া আসে। বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে—ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালিপাথালি প্রহাব করা।

মহেশ ডাকে, বিভূতি।

বিভূতি দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরাইয়া তাকায়। মাধবীলতা দাঁড়ায় কিন্তু মুখ ফিরাইয়া না।

মহেশ বলে, এখানে এসো।

বিভূতি কাছে আসে এবং হাই তোলে। মাধবীলতা সঙ্গে আসে কিন্তু মুখ নিচু করিয়া থাকে।

মহেশ বলে, প্রভুকে প্রণাম করো।

সদানন্দ বলে, তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি করছ মহেশ। সদানন্দের গলা কাঁপিয়া যায়।

মহেশ হাতজোড় করিয়া বলে, বাড়াবাড়ি প্রভু ? ও যদি আপনাকে এখন প্রণাম না করে আমার যে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যেতে হবে প্রভু !

সদানন্দ বলে, তাই যাও তুমি, বজ্জাত কোথাকার ?

মহেশ তখনও হাতজোড় করিয়া বলে, ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু ?

সদানন্দ বাক্যহারা হইয়া থাকে। মহেশ বলে, বিভূতি প্রণাম করো প্রভুকে।

বিভূতি নড়ে না। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া সশব্দে মহেশের গালে বসাইয়া দেয় এক চড়।

কিছু দূরে চালার নীচে আশ্রমের অধিকাংশ নরনারী জমা হইয়াছিল ; দু-চারজন করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতেছিল। সদানন্দ আজ আত্মজ্ঞান লাভের প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মচার্যের স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। সকলে নিঃশব্দে সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাঠের গুঁড়িটার কাছে এদের লক্ষ করিতেছিল। ততদূর হইতে কথা বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সকলের চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গির

নির্বাক অভিনয় দেখিয়া বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল যে রীতিমতো একটি নাটকীয় ব্যাপারই ঘটতেছে। সদানন্দ আগাইয়া গিয়া মহেশ চৌধুরির গালে যে চড় বসাইয়া দিয়াছে, এটা তারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল। হঠাৎ একটা জোরালো গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।

সদানন্দ সকলের আগে একবার চাহিয়া দেখিল চালার দিকে। অনেক সাক্ষীর সামনেই মহাপুরুষ সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরিকে মারিয়া বসিয়াছে বটে। এখন কেবল ঘটনাটা সকলের চোখে পড়িল, পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে।

রত্নাবলীর চোখ আর দাঁত দুইই তখন চকচক করিতেছে। মাধবীলতা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে ডান হাতের চারটি আঙুল—ছেলেবেলায় মাধবীর এই অভ্যাসটা ছিল, বড়ো হইয়া কোনোদিন এ ভাবে সে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দেয় নাই।

থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল সকলেই, কিন্তু দেখা গেল অবাধ্য বিভূতি বাপের অপমানের প্রতিকার করিতে বড়োই চটপটে। মহেশ চৌধুরির মোটা বাঁশের ছড়িটি কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখা ছিল। চোখের পলকে লাঠিটা তুলিয়া নিয়া সে সদানন্দের দিকে আগাইয়া আসিল। দেশের জন্য মানুষ খুন করার কেবল পরামর্শ করাব জন্য এতগুলি বছর সে আটক থাকিয়া আসিয়াছে, আজ বাপের জন্য হয়তো সত্যসত্যই মানুষ খুন করিয়া বসিত। বাধা দিল মহেশ।

ছি বিভূতি, ছি !

বিভূতির হাতের লাঠি ছিনাইয়া নিয়া সদানন্দের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহেশ চৌধুরি তার নাখা গুঁজিয়া দিল।

আপনাকে রাগিয়েছি, আমায় মাপ করুন প্রভু। ছেলে আমার আপনাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠেছিল, আমায় মাপ করুন প্রভু।

প্রায় আর্দনাদ কবার মতো চিৎকার করিয়া বিভূতি বলিল, তোমার কী লজ্জাশরম নেই বাবা ?

কী বকছিস তুই পাগলের মতো ? প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে প্রণাম কর। ও বিভূতি, শিগগির প্রণাম কর প্রভুকে। আমি না তোমার বাপ বিভূতি ? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস, হাত যে তোমার খসে যাবে রে, কুষ্ঠ হবে যে তোমার হাতে ! শিগগির প্রণাম কর বিভূতি, প্রভুকে শিগগির প্রণাম কর।

পাগল হইয়া গিয়াছে মহেশ চৌধুরি ? বিভূতি সত্যে বিষয়ে সদানন্দের পদতলে বাপের সর্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ চাহিয়া দেখে আর তার অভিনব মন্তোচ্চারণ শুনিয়া যায়। মাধবীলতা কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলে, প্রণাম করে নিন। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ি যাই চলুন।

বিভূতি একটু ইতস্তত করিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া যায়। মহেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সদানন্দের পা দুটিকে মুক্তি দেয়। হাত জোড় করিয়া নিবেদন জানায়, প্রভু আশীর্বাদ করুন ছেলের যেন আমার সুমতি হয়।

নয়

বিকালে মহেশ চৌধুরির বাড়িতে সকলে পিঠা পায়ের খাইতে বসিয়াছে। খাওয়ার জন্য বিভূতির লুন্ধ ব্যাকুলতা দেখিয়া তার মার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। ছেলে বাড়ি ফেরার পর বিভূতির মা আজকাল কেবল নানা রকম খাবারই তৈরি করে। বিভূতি খাইতে পারে না, সামান্য কিছু খাইলেই তার পেট ভারিয়া যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মতো উগ্র খাওয়ার লোভের তার তৃপ্তি হয় না। তার চাহনি দেখিয়া কত কথাই যে মাধবীলতার মনে হয়। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় সে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

ভিতরের চওড়া বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে বসিয়াছে, মুখোমুখি হওয়ার সুবিধার জন্য। বৈকালিক জলখাবার শেষ হইতে কোনো কোনো দিন দু-ঘণ্টা সময়ও লাগিয়া যায়। রাজ্যের কথা আলোচনা হয় এই সময়। আজ কথাবার্তা তেমন জমিতেছিল না। সকালের ঘটনায় একমাত্র মহেশ চৌধুরি ছাড়া সকলেই কমবেশি অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

হঠাৎ বিভূতি বলিল, আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

মহেশ চৌধুরি হাসিয়া বলিল, কে আগে কথা তোলে দেখিলাম। পাগলামি মনে হয়েছে তোদের, না ? কেন বল তো ? পাগলের কথা কাজ কোনো কিছুব মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিযোনি, কিছু করিযোনি।

বলোনি ? করোনি ?

না। আমি আবোল-তাবোল কথা কোনোদিন বলি না, খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে, তা সেটা সবারই হয়।

এ রকম অহংকার তো কখনও দেখিনি তোমার ! নিজেকে প্রায় মহাপুরুষ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ।

মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়িল, তা করিনি, একটা সোজা সত্যকথা বলেছি। তোর অহংকার মনে হল কেন জানিস ? তোর সঙ্গে কথা বলার সময় আমাব মনে আছে তুই আমার ছেলে, কিন্তু আমাব বিচার করার সময় তুই ভুলে যাচ্ছিস যে আমি তোর বাপ। কথাটা প্রভুকে বললে অনাভাবে বলতাম—শুনলে আমার বেশি বিনয় দেখে তুই চটে যেতিস, তখন তোর খেয়াল থাকত যে আমি তোর বাপ, আর নিজের বাপের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অভাব দেখে লজ্জায় দুঃখে অপমানে তোর মাথা হেঁট হয়ে যেত।

এ ভাবে মহেশ চৌধুরিকে কথা বলিতে মাধবীলতা কখনও শোনে নাই। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে মহেশ চৌধুরির কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ চৌধুরি আবার বলিল, আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কী বুঝিস জানিস ? ফাঁকা গর্ব, গোঁয়ারতুমি। মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া তোদের আত্মমর্যাদা টেকে ন্ন, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হয়ে যাবে, লাঠি মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা খাড়া থাকতে পারবে। কী বলো মাধু, তাই নয় ?

মাধবীলতার মুখ ভর্তি ছিল, খাবারটা গিলিয়া কথা বলিতে হওয়ায় বড়োই সে লজ্জা পাইল। কী জানি, ও সব বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা ভালো বুঝি না।

মহেশ চৌধুরি হাসিয়া বলিল, বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম ? জানলে তো বলব ! আচ্ছা, কথাটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।

থাক না, আমার না বুঝলেও চলবে।

উঁহুঁ, তা চলবে না। কথাটা তোমায না বুঝিয়ে ছাড়ব না।

মহেশ চৌধুরির একগুঁয়েমিতে মাধবীলতার হঠাৎ বড়ো হাসি পায়। মনে হয়, সে যদি কথাটা না বুঝে, সদানন্দের চরণ দর্শনের জন্য একদিন যেমন ধন্য দিয়াছিল, আজ সকালে যেভাবে বিভূতিকে সদানন্দের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাইয়াছে, তেমনই একটা কিছু কাণ্ড মহেশ চৌধুরি আরম্ভ করিয়া দিবে।

বুঝেও যদি না বুঝি ?

মহেশ চৌধুরি শাস্তভাবে বলিল, হেসো না, হাসতে নেই। বুঝবে বইকী, বললেই বুঝবে। শোনো বলি। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে যে ঝগড়া করলে, মানুষটার মনে কষ্ট দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলে, আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তো ? তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললে সবাই তোমাকে ভীৰু অপদার্থ মনে করবে, লোকের কাছে তোমার অপমান হবে।

ব্যাপাবটা কী বিশী দাঁড়িয়ে গেল বলো তো ? তুমিও উলটে-পালটে সারাদিন ওই কথাই ভাবছ, বিপিনবাবুও ভাবছেন। তোমাদের দুজনেব মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি হাসিমুখে দুটো মিস্তিকথা বলতে, একমুহুর্তে বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমিও চাইছিলে ঝগড়া না হয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে ভাব হোক, বিপিনবাবুও তাই চাইছিলেন—আত্মমর্খাদি বাঁচাবাব জন্য তোমাদের ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা কর কিনা তাই এমন হয়। নিজের যাতে কোনো ক্ষতি নেই পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও করতে পাব না।

মাধবীলতা কথা বলিল না।

বিভূতি বলিল, গালে যে চড় মানে তাব পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেয়ে ও রকম ঝগড়া ঢেব ভালো।

মহেশ চৌধুরি বলিল, গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে আমার কি শুধু এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি ? আমি তো চিবাদিন প্রভুর পায়ে লুটিয়ে আসছি ? প্রভুকে যদি আগে থেকে দেবতার মতো ভক্তি না কবতাম, আজ গালে চড় মারাব পর মানুষকে আমার ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দেখাবার জন্য প্রভুর পায়ে ধরতাম, তা হলে অন্যায় হত। তাব মানে কী দাঁড়াত জানিস ? আমি যেন প্রভুর চেয়ে বড়ো। কিন্তু প্রভুর সম্বন্ধে আমার অহংকার নেই, দীনতা নেই, উদারতা নেই—আমি সোজাসুজি তাঁকে দেবতাব মতো ভক্তি কবি। গালে যখন উনি চড় মাবলেন, আমি বুঝতে পাবলাম উনি ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার মনে বড়ো কষ্ট হল, তাই ওঁব পায়ে ধবলাম। উনি আমায় বড়ো ভালোবাসেন বিভূতি—আমায় মারার জন্য না জানি মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছেন।

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মানুষেব পক্ষে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করা—

মহেশ চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে সায দিয়া বলিল, উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতাব মতো ভক্তি করে না। কিন্তু সংসাবে কটা মানুষ আছে বলো তো ? যে মানুষ নয় সে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি কববে না কেন বলো তো ? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বগ হয়ে যেত।

এবারও বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আর একজনকে দেবতাব মতো ভয়ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশি অমানুষ আছে—সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে আর একজন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা থাক—আমাকে কেন তুমি জেব কবে ওঁকে প্রণাম করালে ? আমি তো ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি কবি না। ববং—

মহেশ চৌধুরি তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলে তোকে প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না কবিস সে কথা ভিন্ন, তোকে দিয়ে ওঁকে প্রণাম কবাবার ক্ষমতা থাকতেও যদি প্রণাম না করাতাম, আমার পক্ষে সেটা অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না !

বিভূতি মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ স্বয়ং সদানন্দ মহেশ চৌধুরির বাড়ি আসিল।

সকলে ভাবিল, বুঝি সকালবেলা মহেশ চৌধুরির গালে চড় মারার প্রতিবিধান করিতে আসিয়াছে। ভক্তকে সদানন্দ আজ অনেক আদর করিবে।

মহেশ চৌধুরি তাড়াতাড়ি প্রণাম কবিয়া বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ বলিল, মহেশ, বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়িতে থাকব।

দশ

এ কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে ! অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিষয় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ !

বটে ! বিপিনবাবুর স্পর্ধা তো কম নয় !

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া উর্ধ্বমুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু ? আমার এত বড়ো সৌভাগ্য হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ জীবন সার্থক হল। এ বাড়ি আপনার, এ বাড়ির মেয়েপুরুষ আপনার দাসদাসী।

ব্যাপারটা কী হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরনের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়াব জনাই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মহেশ চৌধুরিও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা কবে, তারপর খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিয়া বসে, আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু ?

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরি বলে, কী যে তুমি বল মাধু ? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে ? উনি রাগ করে চলে এসেছেন তাও বুঝতে পার না ?

সদানন্দ বলে, না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।

মহেশ বলে, তাই কী হয় প্রভু ! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কল্পেও নেই।

সদানন্দ বলে, তা আছে বইকী। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক-বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবি করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই---

আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি ! মহেশ চৌধুরি একগাল হাসে, ক-বিধা মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনও বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু ? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম ! আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।

সজ্ঞারে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আপশোশের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কী সর্বনাশটাই নিজের করে।

মহেশ চৌধুরি সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরির ঘরবাড়ি সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষা-মাজা ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভালো ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনাকোরা নতুন তোশক পাতা হইল—একটু ছোটো হইল তোশকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোশক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোশক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এককোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধূনা আর কোণ ঘেঁষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটোবড়ো আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরি করিল ! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরির বাড়ি ছিল

নিস্তর, মহেশ আর তার ভাগনে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চূপচাপ এ বাড়িতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ—মাধবীলতার পদার্পণের পর সেই যে একটু জীবনের সাদা জাগিয়াছিল বাড়িতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চূপচাপ ছিল এখনও তেমনই চূপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বউ। কোন ফাঁকে কখন বাড়ির কোন আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেঁকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বউ যে বাড়িতে থাকে অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুরে যাওয়ার সময় উঠানের কোণে পিছন হইতে তাকে পাকড়াও করিয়া বলিল, বউমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না করো। চান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমন করে।

শশধরের বউ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরির দিকে পিছন করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরি সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ কবিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা কবিতো গেল, শশধরের বউ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো ?

সদানন্দ বলিল, বাড়াবাড়ি করো না মহেশ, বাড়াবাড়ি করো না।

মহেশ বলিল, না, প্রভু।

সকলের জন্য যা রান্না হবে আমিও তাই খাব। আমার ও সব নেই জান তো ?

আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষভাবেই রান্নাটা কবাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, তুমি আমায় টিকতে দেবে না মহেশ।

মহেশও হাসিয়া বলিল, আপনাকে আমি আব ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।

অন্য কেহ হইলে হয়তো এ কথার জবাবে তামাশা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ ? কিন্তু ও সব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সদানন্দের এটা যেন ভালো লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে কয়েকদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কী রকম মন কেমন করিয়াছিল সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনই মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলই মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনই আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরি বলে, আশ্রম থেকে আপনার জিনিসপত্র সব আনিয়া নিই প্রভু ?

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, না, না, এখন থাক। তাড়াতাড়ির কী আছে !

জন্মের মতো আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনোদিন বিপিনের ওই জমিদারিতে সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কীসের

সম্পর্ক ? তবু তার নিজস্ব জিনিসপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে একটু খেন যোগাযোগ বজায় রাখিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তা ছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিসপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও রাগিয়া যায়, তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওয়াব সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে !

মহেশ চৌধুরিও বোধ হয় এ সব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্তত তাই মনে হয়। জিনিসগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন আনাইলেই বা দোষ কী ? এক মুহূর্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন ? মহেশের তো তা সহ্য হইবে না !

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।

বিপিন তাকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে সদানন্দের এ রকম আশা করার একটু কারণ ছিল। বিপিন সতাই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও। সদানন্দও রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাকে এ ভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য নয়।

সেদিন সকালে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতাব আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিড়তিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল তারপব সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাতে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছিল, সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মতো আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই ?

আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকব যে তোর সব হুকুম মেনে চলব ?

ও সব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোনোদিন আমি ও বকম ব্যবহার করিনি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চল মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দ্যাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমাব একটা কথা মানবি একটা কথা মানবি না, তাহলে কি আশ্রম চলে ? আশ্রমের জন্য তোকে দরকাব আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি ?

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছিল। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস তেমনভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।

না হলে কী করবি ?

তোকে বিদেয় দেব।

বিদেয় দিবি ! তোর তো স্পর্ধা কম নয়। তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—

আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে ? বিপিন হাসিয়াছিল।

সদানন্দ সর্গর্বে বলিয়াছিল, আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে তা জানিস ?

বিপিন নির্বিকারভাবেই বলিয়াছিল, বলেই দ্যাখ না মুখের কথাটা ?

কথাটার ইঞ্জিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে কিন্তু তার সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনই একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছিল, তুই বড়ো বোকা সদা। সবাই টিপটিপ করে প্রণাম করে আর তুই ভাবিস তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে ! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মতো চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে বেখেছে। কল্পনা জগতের আবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় কবাতো হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেউ যাতে না পায় সেই জনাই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কী রকমের ভয়ভক্তি করে জানিস ? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অভ্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড়ো সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোব বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।

মাধুকে নিয়ে কী বোকামি কবেছি ?

জানিস না ? তা, নাও জানতে পাবিস ! চোর কী করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশি বেশি সাধু বনে থাকে, আব চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু ? আহা, একটা মেয়ের কাছে কী করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের ! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট কবে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারও দুবার ভাবতে হবে না কীসের মানে কী।

এবার সদানন্দ রাগ কবিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপিনের মনটাই কদর্য। কতদূর কদর্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিপিন যা ভাবে কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মতো কুৎসিত মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়োলোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্যন্ত আমার তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, বাস। আর কোনো কিছু অধিকার তোব নেই।

আচ্ছা, রাজাসাহেবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।

রাজাসাহেব ? বাজাসাহেব কী করবেন ? দুদিন আগে রাজাসাহেবের যা খুশি করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কী ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি ? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কী করবেন বল রাজাসাহেব, ক-বিঘা জমিব জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।

জেল !

আমি না বাঁচিয়ে দিলে মাধুর জন্য নারায়ণবাবুর জেল হত বইকী।

ও !

সদানন্দ চূপ করিয়াছিল অনেকক্ষণ।

আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল ?

ছিল বইকী। আমার নামে আশ্রম হল। আশ্রমের আয় আমার হবে না ? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক-জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা ? তখন তোরা ভাবতেও পারিসনি একদিন আশ্রম এত বড়ো হবে---দিনরাত কেবল কানেব কাছে ঘ্যানঘ্যান করতি, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসাহেবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেননি, তাই প্রথম দফার অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কী জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে আশ্রম নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছিল, তারপর আবার বলিয়াছিল, এ সব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর মাথা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের এতদিনের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবি তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুশি নিজের একটা ছোটোখাটো আশ্রম তুই খুলতে পারবি।

রাত্রি বাড়িবার জনাই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। দুজনে চূপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভালো করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুবুতর তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কী গুবুতর সেই দেখার ! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কী বলিত অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

আরও একটা জিনিস তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।

বিপিনের শেষ কথাটার কোনো মানে হয় ? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি ! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নাই তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে। কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে ? মনটা কী রকম জ্বালা করে ? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে ?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিশ্চিনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধাতার মতো মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুশি করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

ব্যাপার কী বলুন তো ?

এসো মাধু। বোসো।

বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কী হল ?

ব্যাপার আর কী হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটোলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায় ? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর কবিতা বলে, আপনাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মাবামাবি করবেন তো কাজ হবে কী। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এ সব কাজে কেন আসেন আপনাবা ?

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।

পারলে তা কবতেন।

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ বাগ কবিতা বলে, আমাকে কি তুমি বিপিনের মতো অপদার্থ ভাব ? বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।

মহাপুরুষ ভাব বুঝি ?

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ কবিতা বলে, বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি !

মাধবীলতা আব সে মাধবীলতা নাই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপলা হাবহিয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব কবিতা কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিবের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ কবাব অভ্যস্ত ভিজিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ কবিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুসি ভাবপ্রবণতাব আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতাব জবাবেও যাতে মাথা তুলিবাব সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তাবপব ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ কবটা তাব নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগব মন্তব্যে সদানন্দ বাগ কবিতাছিল, এবাবকাব ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে, তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমাব উপায় নেই !

কেন ?

তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিবে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নিচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে, রাগ করলে মাধু ? শোনো, শূনে যাও---

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়েই অব্যথা হইয়াছে, কোনো কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা কবুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সংকোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কী বঝাইয়াছে সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরির বাড়িতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঞ্জিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরির বাড়িতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঞ্জিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটানোর পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই

বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কী বলিয়াছে কী বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ হয় না। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্ধানের একটা সাধারণ ও সজাত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্যসত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয়তো সেই সঙ্গে এ কথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে কয়েকদিন পরেই সাধুজি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশেপাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝাঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রম ত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরিকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

এখন সকলকে জানিয়ো, আমি এমনি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।

প্রভু ?

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলিনি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি এ কথা অস্বীকার করবে কেন ? শুধু বলবে যে কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়েই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরি বলে, আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলিনি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।

আমি এখানে এসেছি এ কথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ ? দুদিন একটু শাস্তিতে থাকতাম।

আপনি এসেছেন এ কথা কী ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু ? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্যকে কী লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু ! কাল সকালে যখন এলেন, তখনই গাঁবেব অর্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিইনি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামিও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে দ্যাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কী কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। মেয়ে দরকার হয় এমন সাধনাও তো সাধু পুণ্ড্রেরা করে, শবসাধনার মতো যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামি নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামি নেওয়া হইবে কিনা সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

কী করব প্রভু ?

তুমি কী বলো মহেশ ?

আমার মনে হয় প্রণামি এখন না নেওয়াই ভালো। এখন প্রণামি নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামি নিলে দোষের হবে না।

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ? কে জানে প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কিনা ! হয়তো এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে

যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশি প্রকট যে দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণিতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয়তো বিপিনের মতোই ভালো উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে বারণা পোষণ করে যে রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মতো জগতের পীড়িত বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকাব মতো ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এ সব মনে হয় অন্যায়ে কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ে প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে, এ কথাও সত্য যে বিপিনেব ঘোরপাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তাব অতি মহৎ এটা বুঝা গেলেও প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও কখনও জোর করিয়া ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপাঁচ আছে, মতলব হাসিল কবিবার জন্য তলে তলে সে চলিতেছে চাল।

কেন এমন হয় ? দশজনের ভালোর জন্য একজনেব সর্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায়ে মনে করে না কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এই জন্য ? সদানন্দের মনে হয়, আবও অনেক কাবণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যাব শাখাপ্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোটোবড়ো নানারকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না ? কী সেই গুণ মহেশের এবং কী সেই দোষ বিপিনেব অথবা কী সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কী সেই গুণের অভাব বিপিনের যাব জন্য দুজনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে ?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, আচ্ছা, এখন তবে প্রণামি নিয়ো না।

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরিকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম গুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরির মুখখানা আনন্দে এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এগারো

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোনো শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদেব না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না তা নয়। বিপিনের কোনো কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কী এমন ভক্ত তার একজনও নাই বিপিনেব কোনো কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দবকার মনে করে ? মুখখানা তার বড়ো বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গান্ধীর্ষ, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষন্ন দেখাইতেছে সে ভাবে, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন ? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির হয়। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, কী করে এলি !

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, এলাম।

মাথবীলতা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—
চুপিচুপি এলাম যে লুকিয়ে।

কেন, লুকিয়ে কেন ?

বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে ?

দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।

আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে ? এখানে থাকতে পাব কিনা না জেনে আগে থেকে
ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরির চেষ্টায় এ ঘরে বাড়িব সকলের ঘরোয়া
মজলিশ বসিয়াছে। হাতেপায়ে ধরিয়া সদানন্দকেও মহেশ এ মজলিশে টানিয়া আনিয়াছে। শতরঞ্ধ
বিছানো প্রকাণ্ড চৌকিতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোটো চৌকিতে ঘরে
বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটিবে মাঝে মাঝে শিষ্য ও
ভক্তদের মজলিশে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করা, এ সব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিশের সঙ্গে এ মজলিশেব
অনেক তফাত। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে
সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানোর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয়ে ভয়ে। এখানে
মহেশ নিজেই বাজেগল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে বিভূতি রস দিয়া দেশের
কাহিনি বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতোছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই ! বিপিন
সদানন্দকে আড়ালে বাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উলটা,
সে যেন সকলের সামনে আনিয়া আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে
চায়। বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে
আসিয়াছে, ছেলের দুর্দশাব রসালো কাহিনি শুনিতে শুনিতে তার চোঁখ ছলছল কবিতোছিল। ঘবে
আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা-টানা বউ। তবে তাব অনুপস্থিতিটা কেউ একবাব খেয়াল
কবিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ির কাবও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার
কঠিন সাধনায় বউটি প্রায় সিদ্ধিলাভ কবিয়া ফেলিয়াছে।

বত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরি বলিল, তুমি তো আমাব মেয়ে, মা ? এখানে থাকতে
পাবে কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা !

রত্নাবলী এবার হাসিল না। —না না, এমনি কথাটা বলেছিলাম মাথকে তামাশা করে। থাকতে
পাব বইকী এখানে।

তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড়ো সুখী হব মা।

আমি তো যখন খুশি আসতে পারি, কেবল উমা মাসির জন্যে— রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল, প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজি হবেন
না ?

মনে তো হয় না। উনি বড়ো চটেছেন।

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার
জিজ্ঞাসা করিল, উমা চটেছে কেন ?

আজ্ঞে, আপনি সম্ম্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।

সম্ম্যাস ছেড়ে দিলাম ? সম্ম্যাস ছেড়ে দিলাম মানে ?

সম্ম্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেননি আপনি ?

বিপিন বলেছে বুঝি ?

রত্নাবলী খাড়া নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, তা ছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ি তিন রাত্রির বেশি বাস করছেন কী করে।

সদানন্দের তীর দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চৌধুরি চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না ?

বত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, আঞ্জে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।

ওঃ ! বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আর কী বলেছে বিপিন আমার নামে ? মহেশ চৌধুরি হাতজোড় করিয়া বলিল, প্রভু ?

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কী বলেছে বিপিন ?

রত্নাবলী বলিল, আমি আর কী বলব, ও তো সবাই জানে।

তবু তুমিই বলো না শুন।

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন না কিছু ?

সদানন্দ বলিল, না। কী জানি না ?

‘তা’র তো সত্যি নয় ! খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভালো করিয়া পরিস্ফুট হয় না। — ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম ! সত্যি নয় তবে ! কী কাণ্ড মা, আঁ ! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু !

কী ছাবলামি করছ রতন ? কী সত্যি নয় ? কী বলেছে বিপিন ?

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুখড়াইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়, ছি ছি।

কিন্তু আর কী এখন উচ্চারণ না করিলে চলে ? কদিন ধবিয়া আশ্রম আব বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গবম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা ! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, রতন !—আর সে ডাক শুনিয়া ঘবেব সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

আমার দিকে মুখ করে বোসো।

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

চোখের দিকে তাকাও আমার।

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

এইবার বলো।

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে বটিয়াছিল সদানন্দ সন্ন্যাস তাগ করিয়াছে। তারপব কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস তাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এ সব খবর আর কে ছড়াইবে ?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন ? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন ! যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের বিরুদ্ধে কেউ

আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এইরকমভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বডেই দুর্বল অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া চলিতে পারে, সেই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোনো একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে ? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানাকথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতেপায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিভে—অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত বিপিন ! বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোনো দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয় ! কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ-সুবিধা কীভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ি তিনরাত্রির বেশি বাস করা যে সন্ন্যাস ত্যাগের কত বড়ো একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এ ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকি থাকে নাই ! আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেয়াল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভালো ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরির এ বাড়িতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়িতে গৃহিণী আছে, একটি বউ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসাযাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরির বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসাব সপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দুদিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগাবের উপায় যে আশ্রম ! কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই, কেবল এত বড়ো সাধু যে সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছা জন্য বড়ো বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ ভাবিবে, কোনো কারণে বিবাহ ভাঙিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোনো রোমাঞ্চকর গোপন সাধনাব জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এ সব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মনে দেখা দিয়াছে আশেপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধুসন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কী রকম সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু-সন্ন্যাসীর কিছু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে তাকে বলে ‘মাতাজি’ এবং টিপটিপ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধুসন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধুসন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্তপুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কীসের ? কত বদমেজাজি সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সে জন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপূর বশ, রিপূই যখন দমন করিতে পারে নাই এ আবার সাধু কীসের ? রাগারাগি গালাগালির জনাই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র।

তবে জটাভঙ্গবিবর্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিবুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক বকম খঁতখঁতানি থাকে। এ সব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, বোগ ভালো করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুনিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিন যাপনের কাহিনি শোনায় না, মাটির নীচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যাস্ত হইয়া উঠিয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরনের সাধুর পর্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরি।

বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরির কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরির দিকে যে ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন ডিঙাইয়া ও পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কানে বিভূতির মার আদর করিয়া পবাইয়া দেওয়া দু'দুটি কানের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দু'লিতে লাগিল, রত্নাবলী'ব এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপব খোঁপা ঠিক কবিত্তে করিতে রত্নাবলী বলিল, সত্যি ?

মহেশ চৌধুরি হাসিয়া বলিল, সত্যি বইকী মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—

দিন ঠিক হয়নি ?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা ?

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবাব সদানন্দ বলিল, মহেশ ?

প্রভু ?

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, কিন্তু তুই কী মাধু ? আমায় জানাসনি কিছু ?

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক বকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীর মুখে ডাকিল, বাবা ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু এখন নাই বা বললি ? ভেবে-চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে ? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন ?

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার স্দলে কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে গম্ভীর মুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল, তোমার ব্যাপাব কিছু বুঝতে পাবছি না মহেশ।

প্রভু ?

মুখখানা একবার একটু বিকৃত কারিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, ঘরে গেলাম মহেশ। ঘন্টাখানেক পরে একবার শূনে যেয়ো।

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, তুমি আর মেয়ে পেলে না ?

কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।

আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়োনো মেয়ে !

অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে কবলে তো। দ্যাখো, হয়তো শেষ পর্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজি হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে—চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, এখনও বুক কাঁপছে দ্যাখো। :

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এত রাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে তা কী আর রত্নাবলী জানিত না ? এবং সঙ্গে যে যাইবে তার শশধর হইতেই বা বাধা কী ?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কী উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরি ! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে ! কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কী কারও কল্পনাতে ছিল ?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সেই কিছু জানে না ? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তাব বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে ? কিন্তু, তাও কী সম্ভব !

কী হইবে এবার ? মহেশ চৌধুরি তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কী ? সদানন্দ কী বলিবে ? কী করিবে সদানন্দ ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে ; আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই, তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে !

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সবচেয়ে বড়ো হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করাব কথা সে কখনও ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবনসঙ্গিনী হইতে নিজে সে রাজি আছে কি না নিজেই সে তা এখনও জানে না। তবু সদানন্দ কী ভাবিবে, সদানন্দ কী বলিবে, সদানন্দ কী করিবে কল্পনা করিয়া সর্বাঙ্গে যেন রীতিমতো অপরাধমূলক ভয়ের টিপটিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মতো। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বউ। ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

দিদি ?

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বউটির রং খুব সুন্দর, মুখের রং আরও টুকটুকে।

ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি ?

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কী যে বিশ্রী শুনাইল বলিবার নয়। বউটি ফোকলা।

সদানন্দ বলে, তবে কী তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোনো কথাই হয়নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে ? মহেশ বলে, আশ্চর্য না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।

সদানন্দ বলে, ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ ! দুজনে সর্বদা মেলামেশা করছে, ওদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কী। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল ? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার ?

সময় পেলাম না যে প্রভু ? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরি না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোনো কথাই তাহলে উঠতে পারে না।

বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে ?

আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠান্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আব মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরির কিছুমাত্র সন্দেহ আছে, কারণ মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারণ সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দুঘণ্টা আগেও তাদের ইজ্ঞাতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরি জানে এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরির একগুয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভালো বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কী করে ? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভালো লাগেনি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওব বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।

প্রভু ?

তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে ? আমি কী সাধে ওকে বেছে নিয়েছি ! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায় !

প্রভু ?

বলো না, কী বলতে চাও ? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায।

বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, তোমায বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়েব জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু ?

মহেশ হস্তজোড় করিয়া বলে, আপনারা তো অজানা কিছু নেই প্রভু ! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার ? কোনো মেয়েই অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না ? রাজাসাহেবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।

ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কী করেছিল—

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম ? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।

কিন্তু মহেশ—

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনই করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ কববে। ওরা তো আপনারাই সন্তান প্রভু ?

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তি-মাথা চাবুক মারিয়াছে।

বারো

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড়ো ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনোদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভালো লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন না একদিন প্রেম তার হইবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দুদিন ভাবিয়া জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কী?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, আমি কী জানি!

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড়ো অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কী করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়! সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কী করিবে গিয়া? সদানন্দ কী বলিবে সে ভালো করিয়াই জানে। আর ও সব কথা শনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনও ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপটপ করিয়া ফেঁটা ফেঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মতো), তখন হঠাৎ একসময় দুকানে তার তাল লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মপ্রাণির কোনো কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভালো, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপশোশ শুধু এই যে সে জানে, আবার গোড়া হইতে সব শুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মপ্রাণি আর মাথার অনির্দিষ্ট দুর্বোধ যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দুকানে তাল লাগিয়া পাওয়া যাইবে শাস্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কী কোনো অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল-টাগল হইয়া যাইবে না তো?

সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যাবে বইকী, বাঃ রে!

একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।

ভয় আবার কীসের?

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মতো অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুশি করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?

মাধবীলতা পুতুলের মতোই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নিচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, আপনি যদি বারণ করেন—

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙুলগুলিকে সেদিন পাখির পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল,

এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), আগে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দেয়। সতাই কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি ? চোখ দেখিয়া মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কী মানুষেব এমন চোখ হয় ? কী করিবে সদানন্দ ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো ?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাতে শক্ত করিয়া তার বাঁ-হাতের কবজির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়ামমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, বাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর কবিতোছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টেব পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ংকর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিবদিনের জন্য পঞ্জু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কী ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এইরকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোনো রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ অশর্চ্য নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ-হাতের কবজিটা তার ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথার মধ্যে এমন বিম্বিম্বিত করিতেছে যে বাখাটা ভালোরকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্মারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরেই কুজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় বকিতে লাগিল। বোধ হয়, আয়ত্নস্ফরিত এত বড়ো অল্প আয়ত্ন কবিতা বাখাব জনা মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতার জ্ঞান হওয়ার পর সদানন্দ উদাসভাবে বলিল, আচ্ছা তুমি যাও মাধু।

আপনি কী কবলেন আমার ?

কিছুই করিনি।

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করাই ভালো।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। অপমান করেছেন ? কী অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে ?

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড়ো অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতকগুলি নিয়ম যেন টিল হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কী জিনিস একসঙ্গে সবু আব মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েকদিন পরে পবে কানে যে তার তালা লাগে সেই বীভৎস স্তম্ভতা সর্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথা ভয় (অনির্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় বৃপ থাকে মাধবীলতার জানা ছিল না)—ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিষ্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কীভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—

বিভূতির বৃকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ

করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনই দেখাইতেছে।

একটু বোসো, আমি আসছি।

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, কী করবে ? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তা তো হলই—

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায় ? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দের ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, মাধুর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার মানে ?

দ্যাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—

বাকি কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘৃষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।

ছি বিভূতি, ছি !

আমাকে ছি করছ ? জানো ও কী করেছে ?

জানি বইকী।

জানো ? বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ব হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশির ভাগ করিল শশধরের বউ। কখন কোন ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোটো একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে একটা মস্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, দোহাই তোর, একটু থাম। তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কী আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তাব বিরক্তিব সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সন্মুখে কর্তব্য স্থির করিতে তো এক মুহূর্ত দেরি হওয়া উচিত নয়। এত সেবায়ত্নই বা কী জন্য ? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয় !

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, বিভূতি, বড়ো ঘরের রোয়াকে ভাঙা কাঠের বাক্সোটো আছে না, তার থেকে বড়ো হাতুড়িটা নিয়ে আসবে ?

হাতুড়ি দিয়ে কী করবে ?

একটু কাজ আছে।

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, প্রভু আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরি করিল কী, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বউ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিছু করিতে পারিল না কিছুই, খেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, না না, আমার কর্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।

সুবিন্দল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরির মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দাবুণ আহত। মহেশ চৌধুরির এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন ? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি ! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্নের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরির সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সেই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গৌয়ারগোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো ? একটা ভুল বোঝার দরুন হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরি তাই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভট্টচায় মহেশ চৌধুরির বন্ধু। সে বলিল, তুমি কী উন্মাদ মহেশ ?

কাল পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন ? বলিয়া মহেশ চৌধুরি শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ-বারোজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরি কথাগুলি বলিল, তারা তখন ডাকাইয়া আনিব বিড়তিকে। কী হইয়াছিল ? সদানন্দকে সে কী অপমান করিয়াছিল ? কেন অপমান করিয়াছিল ? কী দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরিকে আঘাত করিয়াছে ?

কিন্তু বিড়তি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, আমি কিছু জানি না। আপনারা এবাব যান তো।

সকলে দয়া করিয়া তাব বাড়িতে পাবেব ধুলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়িব ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরির কত সংকোচ, কত আপশোশ ! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় করিয়া দিল ! ছেলেটা সত্যই গৌয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরি সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টু শব্দও কবে নাই মহেশ চৌধুরি, সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরি বলিয়াছে, প্রভুর প্রহাবের চিকিৎসা ? ছি !

শেষ কথাটাতে সকলে যে কী মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরির যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া ! সকলের কানে যেন বাজিল, মারলি মারলি কলসিকানা, তাই বলে কী প্রেম দিব না।

না জানি কত বড়ো মহাপুরুষ সদানন্দ যার জন্য মহেশ চৌধুরির এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিশ্বম্ভয়ে হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয়তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিসফিস করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কানেকানেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে, গৈয়ো পথের ধারে কয়েকটি জমকালো গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কানাকানি হয়। অকালবার্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্রিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিশ্বয়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।

মহেশ চৌধুরি বলে, আর ও কথা কেন প্রভু ? সেদিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে ?

চুকে গেছে বললেই কী সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ ?

আজ্ঞে তা যায় বইকী। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেইনি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোনো কিছুই জের চলতে পারে না প্রভু।

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরি এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশে মতোই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন কবিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরির এখনকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায় ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষমভাবে ঘরেব কোনায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য মজলিশে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারি করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা ? মহেশ চৌধুরি তো বলিয়া খালাস সব চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব ?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুকিতে পারে, ব্যাপারটা সত্যসত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আব মাধবীলতা যে একটু সংকোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে প্রথম দিকে এটা পবিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অনাদিনের মতো সহজভাবে সকলের হাসি গল্প যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুশি হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড়ো খাবাপ হইয়া গেল। আব একবার সে যেন মহেশ চৌধুরির কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিত পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরির কাছে সে যে ছোটো হইয়া গিয়াছে আজ এই সান্ধ্য মজলিশে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরির, তাকে হীন করাব জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজে মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনও মহেশ চৌধুরির মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে—কী সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরি !

তেরো

যাই হোক, একদিন যথার্থিতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। এমন পরিবর্তন যে দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ কবিয়াছে ?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আর একদিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল, সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশি। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরিকে বলিয়া

গেল যে, রেযারেসি আশঙ্কা করিবার কোনো কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কী বিপিনবাবু ?

প্রশ্নটা অসংগত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চাষিদের যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়িতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না কবিলেই ভালো হইত। মহেশ চৌধুরিকে বিপিন কোনোদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ি বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য ? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা ! জিজ্ঞাসা কবাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোনো জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরি আবাব বলিয়াছিল, সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রভু যতকাল ছিলেন ততকাল তবু একটা কারণ ছিল, গুঁর জন্যে—

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, প্রভুই বটেন !

মহেশ চৌধুরি দুই কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, ছি বিপিনবাবু, ছি !

তবু তো সর্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্যন্ত মহেশকে ঠিকভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলাব সময় দেশ, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোনদিকে, কীভাবে ?

আহা, আশ্রমে কী হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।

মহেশ চৌধুরি সবিম্বসে বলিয়াছিল, কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একবকম কিছুই হয় না ? ভালো একটা জায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন, তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—

এখনও পায়।

কে বলেন ?

আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।

লোকজন আসে ? মহেশ চৌধুরি সন্দিগ্ধভাবে বলিয়াছিল, শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে ?

মহেশ চৌধুরির আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পব বিপিনের আশ্রমে লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন উৎসবটা হইল বেশ জমকালো। শহর হইতে দু-চারজন নামকরা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের আরও অনেক গ্রামের নারী-পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটোখাটো একটি মেলার মতো। তার উপর আবার ছিল কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা। ক-দিন ছোটোখাটো গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল তা সত্যিই অভূতপূর্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরির বাড়ির পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে এক টুকরা আলকাতরা মাখানো চারকোনা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম'। নতুন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে

নতুন আশ্রমের আলোচনাও খামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নীচে বসে, মহেশ চৌধুরির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরির পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্যরকম, দু-পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামির পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে যাবা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কানে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরিই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড়ো মুশকিল হবে। এমনই শিষ্য হতে দোষ নেই, উপদেশ শুনবে, সাধন ভজন পূজা অর্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সংকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে, তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষ্য করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোনো অসুবিধা থাকবে না।

সদানন্দ একটু খুঁতখুঁত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু নির্বিচাবে সকলকে—

মহেশ চৌধুরি বলিয়াছিল, বেশি বাছাবাছি করে লাভ কী প্রভু ? সবাইকে নিয়ে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বললেই বিশেষ কোনো অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি কবার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরি বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দাকানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিষ্যকে শিখায়। মহেশ চৌধুরির মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড়হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মতো করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভালো ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত, হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মতো, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সেই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরিকেই করে বেশি। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই সভয় ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরির উপরে লোকের ভক্তিপ্রসঙ্গ যেন হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরি করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মতো নত হইয়া থাকে,—তবু !

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক স্তম্ভিত একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙনধরা পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। আগের মতো তেজ কী আর তার নাই ? আগের সেই সহজ

আত্মবিশ্বাস ? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আবস্ত করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে ? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কী ছিল হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে ? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সভ্যসভ্যই ? আর কিছুই সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যান্যসম্প্রদায় সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর্ব যেরূপ আরও বেশি জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভালো করিয়াই জানে, এমন কোনো পরিবর্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না কারণ যেরূপ যেরূপ লক্ষ্য করা সম্ভব। তবে মনটা কেন যে খুঁতখুঁত কবিত্তে থাকে ! আগে কথা বলান মধ্যও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিত শুনিত নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিজ্ঞত ভাব দেখিয়া নিজে মধ্য একটা অপার্থিব শক্তির সঞ্চারণ অনুভব করিত। এখন কথা হয়তো সে বলে আগেই মতোই, সামনের ভীষু, অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অন্যান্যসাধাৰণ ক্ষমতা যে তার আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই হয়তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপৰ একসময় তার মনে হইতে আবস্ত হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীষু অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মতো কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কাৰণ নিজেই কী সে বুঝিতে পারিতেছে না যে আব সব ঠিক আগের মতো থাকিলেও সমগ্রভাবে ধবিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আব আগের মতো নাই ?

বাপাবটা সদানন্দের বড়োই দুর্ভাগ্য মনে হয়। কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কী তাব নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে ? কখনও ভাবে, এখনকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভালো লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ বকম হইতেছে ? বিপিনের মতো একজন তাকে আড়াল কবিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটিরের অন্তরালে নিজে মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেই জন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে ? অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিৰদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া ?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ কোনো কষ্ট হইতেছে তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সভ্যই বড়ো রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোটো ছেলের যেমন অনুৰাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই ? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কী একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার ?

অন্য একটা কাৰণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে। কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরির পাবিবারিক সাক্ষা মর্জলিশে বাধ্য হইয়া যদিবা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা তফাতে সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে, বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার শখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন ? বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীলতার বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড়ো জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অধিশ্বাস কেন তাকে ? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা ? কী ছেলেমানুষ মাধবীলতা ! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এ রকম উদ্ভট হয় বটে !

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আরও মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এ রকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ানিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নাই, এটা মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বৃদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও ওই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ফাঁপ-ফাঁপের ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বারবার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানাভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শাস্ত ও নির্বিকার সদানন্দ চূপচাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এ রকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তা'ব পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার মতো ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোনো মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশয় না দিলেও বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়ানিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কী প্রেম, প্রিয়কে হারানোর পর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম ? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মর্ধো এ রকম হইতেছে ? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তার সঙ্গে মাধবীলতার কোনো সম্পর্ক নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক দুর্বলতা ঘটিবাব একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জনাই এ ধরনের কথা সদানন্দের মনে আছে।

একসময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেবুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাতজোড় করে—ইচ্ছায়ও নয় অনিচ্ছায়ও নয়। বিড়বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর, দয়া করো। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, এ সময় আমায় দয়া করো। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাক, দয়া করো। তুমি তো সব জানো—তুমি তো জানো কী উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো—কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চূপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যান্যনক্ষও হয়, নিজেকে শাস্ত ও শাস্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড়ো চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, বাড়িতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ ?

মহেশ আহত হইয়া বলে, প্রভু ?

আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলো তো মহেশ ? তামাশা বোঝ না ?

স্কন্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, না প্রভু, আমি সত্যই বড়ো অপদার্থ। আপনি যা বললেন ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মহেশ চৌধুরির মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায বলিবার নয়। অস্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য, তাব সামনে এ ভাবে স্বীকার করাব সাহস হওয়াও তাব চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। এই মহেশ চৌধুরিই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত কবিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে ?

আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ ?

বিশ্বাস করি বইকী প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে আপনি পৌঁছেছেন, এখন আর আপনাকে ঘরগেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সাবাদিন আমাব বৃকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারিনি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না,—আপনি পাববেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভু কঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পঙ্গু না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয় তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরি তাই কি তবে ঠিক ? মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটির সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজেব মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পাষের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা করো—বাঁচাও আমায়।

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিতরে যার পাষেব ধূলা মাথায় ঠেকায় তাকে এ ভাবে পাষে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরির মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবাব যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজভাবেই সে বলে, প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জনাই তো গেরস্থালিব ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কী আমার আছে প্রভু ? নিজেকে আপনাব নিজেবই বক্ষা কবতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনাব নিজেবই বক্ষা কবতে হবে।

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ ! গেরস্থালি ! কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ কবিয়াছে। মানুষটা কী কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ ! মেযেমানুষ নয়, গেরস্থালি ! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে ! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গোরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া নিয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। এমন করে মারাইস, লাগে না গোরুটার ? তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, আহা, তোমার লেগেছে বাবা ? তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।

গরিব চাষাভূসা মানুষ সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে তাও তার অজানা ছিল না। থতোমতো খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, মোটে একটা, আশ্বে ?

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল। ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গোরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না ? যা এখন থেকে, ভাগ, কিছু পাবি না তুই।

আজ্ঞে না কর্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।

কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখন থেকে—গেলি ? দিয়ো না মহেশ, খপরদার দিয়ো না।

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মতো পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নীচে মস্ত আসর বসিলে সকলের সামনেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, আমার মনটা বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে, মহেশ।

মহেশ চৌধুরি ভরসা দিয়া বলে, তা তো যাবেই প্রভু ?

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, যাবেই মানে ? কী যে তুমি পাগলের মতো বলো তার ঠিক নেই।

চোদ্দো

সদানন্দ ভাবে : আমি নিজে যে কী সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন ? সাধনার কোন স্তরে আমি পৌঁছেছি আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরি তা বেশি জানে কেন ? ব্যাপারখানা কী ?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালোরকমেই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় কীভাবে কোন সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কী সাধনা হয়, আর কোনো রীতিনীতি নিয়মকানুন সাধনের নাই ? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্বোধাতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলিব ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্যন্ত নানা ধবনের বিচিত্র চিন্তায় মশগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্যায়েই ফেলে। এক-একজন মানুষ থাকে যাবা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয় ভাগ তারপর ধরে প্রথম ভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জন্ম হয় অনেক ভিপ্রিধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশি, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরেও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধুসন্ন্যাসীর যোগ সাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল, এ সব যে ছেলেখেলা নয় সদানন্দ তা ভালো করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলা এ-ব কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে কোনোমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরিকে ডাকিয়া পাঠায়।

ভয় করছে প্রভু ?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্বোধা বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনোদিন সাধনভজন কিছু করিনি।

রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধনভজন কিছু কবেছেন নাকি, এটা কী প্রভু ? সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক ? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কী, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে ? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আব যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে ততদিন সিদ্ধিলাভেব কোনো ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবাব তো কোনো কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা কবিতোছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক কবিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনোদিন করে নাই লোকের কাছে নিজেকে সেই বকম সাধক বলিয়া পবিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তাপ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো, মহেশ ?

ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু !

সদানন্দ চটিয়া বলে, এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুড় কিছু বুঝতে পাবি না মহেশ।

আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু—তাতে তো ফাঁকিবাজি কিছু নেই। দশজনের ভালোর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা কবাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চাননি, লোকে সাধু ভাবুক অসাধু ভাবুক আপনার বয়ে গেল।

সদানন্দ সন্দেহভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে !

না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন ?

খানিক পবে প্রকারান্তবে সদানন্দ মহেশ চৌধুরিকে এখানে শূইয়া থাকাব অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ বাজি হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা কবিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরি তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, বাগেব জ্বালায় দেহেব মধো কী যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরি বাঁচিয়া থাকাব কোনো মানে হয় না, এই ধবনের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সে লক্ষ কবে। মহেশ চৌধুরির একটা বড়ো রকম দ্বন্দ্বিত করার চিন্তাকে প্রশয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহমনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভারটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তাব পাতাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরিকে মনে মনে হিংসা করিবাব সময়টা জাগ্রত স্বপ্নেব প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমনি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায।

মহেশ চৌধুরিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া আর নিজেকে তার চেয়ে ছোটো মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হইয়া গিয়া সদানন্দ আশ্চর্যকর চেষ্টা করে। অন্তত তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল

শ্লথ করিয়া দেওয়ার মতো উত্তেজনাবিহীন সর্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম ? মহেশ চৌধুরি অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ সব ব্যাপারের সে কী বোঝে, কী দাম আছে তার উপদেশের ? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্ধাও কম নয় লোকটার !

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরি শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ করে ! মুখখানা যেন তার দিনদিন অল্পে অল্পে বিষন্ন ও গভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরি বলে, প্রভু ?

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না ?

কীসের এগোতে পারছি না ? কে বললে তোমাকে এগোতে পারছি না ?

মহেশ চৌধুরির চোখ ছলছল করিতে থাকে, এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু ? এখন পিছু হটতে শুরু করলে কী আর উপায় আছে ! প্রথমটা একটু ভালো লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন এখন তা ভাবতেও পারবেন না।

তোমার উপদেশ বন্ধ করো তো মহেশ।

উপদেশ নয়, কথটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কী বিপদ ঘটছেন নিজেব।

সম্পূর্ণ বৃষ্টিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বৃষ্টিতে পাবে। মহেশ চৌধুরির সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এ রকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না ! নতুন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্যন্ত চাপা পড়া সংকেতের মতোও কোনোদিন অনুভব করে নাই। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিস। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত, সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনো অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে তাদের জীবনও ব্যর্থ—কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্বিকার ভেঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজম্যাজ করার মতো এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা ?—মহেশ চৌধুরির আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরির ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে যে একরকম কথাই বলিতে না, আজকাল হাত জোড় করিতে তুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরির ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দ্যাখে। মহেশ চৌধুরির মতো অন্য সকলের ভক্তি শ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে ? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করিয়া আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনোদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস করিয়া ওঠে। কী করিয়াছে সে ? কার কাছে কী অপরাধ করিয়াছে ? কার সঙ্গে কীসের বাধ্যবাধকতায় সে আটক

পড়িয়া গিয়াছে ? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্বদা ইঞ্জিত করিতে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি !

নিছক ভাবপ্রবণতা ? যে জিনিসটা চিবদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে ? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোনটা মনের দুর্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরেব কোণে নিজের ছেলেমানুষির কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত, এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড়ো করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত—আজকাল ছেলেমানুষিকে প্রশয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন খেপিয়া যায়, ছেলেমানুষিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেই রকম উন্মাদের মতো আতর্নাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, তোর চেহারাটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে সদা।

সদানন্দ রাগিয়া বলে, গেছে তো গেছে, তোর কী ?

বিপিন উদাসভাবে বলে, আমার আবার কী ! তুই মরলেই বা আমার কী।

ফিরিয়া যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরির সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে, সাধুজিকে খেতে দেন না নাকি ? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায় ?

মহেশ চৌধুরি বলে, না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই ? নিজের মনকে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কী দোষ ! বিষণ্ণভাবে মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়ে, অনেক আশা কবেছিলাম, সন নষ্ট হয়ে গেল। কী খেলাই যে ভগবান খেলেন ! এমন একটা মানুষ আমি আর দেখিনি বিপিনবাবু, অবতার বলা চলত। কী যে হল, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছেন।

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরি আবার বলে, গুব্ব নির্দেশ মেনে সাবা জীবন প্রাণপাত করে বড়ো বড়ো যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সেই স্তরে পৌঁছেছিলেন। এক-একবার আমি ভাবি কী জানেন, আমিই ভুল করলাম নাকি ? আমি সচেতন কবিযে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন ? যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমনি অবস্থায় থাকলে হয়তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামনে এগিয়ে চলতেন।

মহেশ চৌধুরির আপশোশ দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায়। এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরি আবার বলে, এ সব লোকের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কী সর্বনাশটাই আমি করেছি বিপিনবাবু ?

যা করেছেন ভালো উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।

তবু আমার ধৈর্য ধবে অপেক্ষা করাই হয়তো উচিত ছিল।

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরি একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরির সম্মান বাড়িয়াছে—মাধবীলতা তার ছেলের বউ।

রত্নাবলী বলিল, আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন ?

মহেশ হাসিয়া বলিল, আমাদের ওখানে কী কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে ?—গিয়ে থাকতে হয়।

উমা বলিল, আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।

আপত্তি ? আপত্তি কীসের ! তবে কী জানেন, আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা তাই আপনাদের নিয়ে যাইনি।

বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলেও আমরা কোথাও যেতে পারব না ! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদি নাকি ?

উঁহু, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুশি যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত ? সে রকম ইচ্ছেও আপনাদের হয়নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই যেতেন, জোর করে যেতেন।

থাকতে দিতেন গেলে ?

থাকতে দিতাম বইকী।

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন ?

মহেশ সহজভাবেই বলিল, রাগ করলে কী আর কবতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাইনি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—কবতেন।

আপনি আশ্চর্য মানুষ ! উমা বলিল।

উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশি রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন ? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

বিবেক বড়ো কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কী ? বিবেকের কামড় এড়াবার এত সহজ উপায় থাকতে জেনেশুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয় ?

জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার ? রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন ? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো কর্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনেশুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধিব দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার ভুল করছে কি না করছে গ্রাহ্যও কবে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরই একঘেয়ে লাগবে।

আপনিও তবে ভুল করেন ?

করি না ? মারাত্মক ভুল করে বসি। সার্থজিকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল কবেছি।

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, বলেন কী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে এমন ভুল আব করিনি।

উমা ও রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি কবে।—কিন্তু বিপিনবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—

মহেশ চৌধুরি মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তাড়াবেন কেন। দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কি না দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কী আর হবে ও সব কথা আলোচনা করে ? ঘন্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরি তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাধ হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসংবরণ করতে পারবেন।

ও কি ফিরে আসবে ?

আসবেন বইকী।

বিপিন চূপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম,

আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারী মুশকিল হয়েছে, তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজি হয়নি।

মহেশ চৌধুরি বলিল, তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।

বিপিন চোখ বড়ো বড়ো করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরি আবার বলিল, এতকাল রাজি হননি, এবার বললেই রাজি হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

পনোরো

বলামাত্র সদানন্দ বাজি হইল না, তবে শেষ পর্যন্ত রাজি সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে কবিল বড়ো খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেন একটু সলজ্জভাবে, সংকোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া :

আমাব সব কথা শুনে চলবি ?

না।

আর খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, কোনো বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না ? করব।

আবও খানিকটা তুলিয়া : আমাব কাছে কিছু গোপন কববি না ?

করব।

তখন সোজাসুজি চোখেব দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, আর একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।

মাধুকে তোর চাই ? কী করবি মাধুকে দিয়ে—ও !

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনোনদিন পবিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থা বিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থা বিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এ ভাবে কোনো মেয়েমানুষকে চাওয়াব মানুষ সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায় দুঃখে ঘৃণায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দাবুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে ?

তাতে কী ?

তাতে কী ? তাতে কী ? ভুই একটা পাঠা সদা, আস্ত পাঠা। আগে বলিসনি কেন, বিয়েব আগে ? তোর কথায় যখন উঠত বসত ?

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়। কী জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড়ো মায়ী কবতাম, তখন কী জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত ! একটা রাত্রিব জন্যে ওকে শুধু আমি চাই, বাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি কবুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহংকারটা ভাঙতে হবে।

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, জীবনের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া

মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোনো মেয়ের আছে এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড়ো করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরালো করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কী করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্যন্ত ! বড়ো জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপশোশ করিয়া বলিত, ছুঁড়িটা বড়ো ফসকে গেল রে বিপিন !

নূতন কবিতা সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরির কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কমবেশি বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোব নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মতো উপভোগের সাধ কোনোদিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মতো মানুষ, অতি অল্পবয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় কবিতা ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপ্ত থাকার মতো মনেব জোব বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্বলতা, অনেক পাগলামির একটা নতুন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরির কথাই ঠিক, ও সব দুর্বলতা শক্তিব প্রতিক্রিয়া, ও সব পাগলামি অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্যসত্যই মহাপুবুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুবুষ সাজিয়া লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিতা নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা প্রচাবের ফুল। এত বড়ো বড়ো আদর্শ সে পোষণ কবিত (হয়তো এখনও করে) যে, নিজের অসাধাবণত্বকে পর্যন্ত তার মনে হইত (হয়তো এখনও হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নিচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং নীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড়ো মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরি যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরিও ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা ! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয় ?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরির বাড়িতে বাস করা, নতুন আশ্রম খুলিয়া নতুনভাবে জীবনযাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরির আশ্রমে সমবেত নারী-পুরুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্য অর্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তি হয়তো দেবতার সর্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরির আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নতুন পর্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরির আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বারোজন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে—আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভারিয়ার ছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরির নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিতে দিবে সকলকেই, কথা বলিবে সহজভাবে। এক নজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তাব কী যে জাগিল উল্লাস আর গর্ব মেশানো একটা নেশা, মুখের গাঙ্গীর্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায় এমনই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামি দিতে গিয়া দু-একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল : উঠে বোসো। তিনমাস মাছমাংস মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও !

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল : পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।

আগে কেউ বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর সদানন্দ নিজের নতুন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নতুন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামি দেওয়ার পরে) আব হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামি—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনোদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত আজ একটু বড়ো ধরনে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু স্নান করিয়া বলিল : ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুরমশায়ের রাগ তো দেখিনি কখনও, সত্যিকারের রাগ ?

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অস্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছিল : উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনাতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।

উমা আর রতন ? ওরা কেন রাজি হবে ?

হবে। আমি বললেই হবে।

তা হবে না। এ রকম মতলবেব কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয়তো চলে যাবে।

সে আমি বুঝব।

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিশ ডেকে আনে ?

আনে তো আনবে।

আনে তো আনবে ? তোর খারাপ মাথাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে সদা।

তুই বড়ো বোকা বিপিন। পুলিশ আশ্রমের ধারে আসা মাত্র উমা, রতন আব আশ্রমের আরও পাঁচ-সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে কেউ মাধুকে আটকে রাখেনি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেবখন।

কিন্তু দরকার কী শূনি এত হাঙ্গামায় ?

সে তুই বুঝবি না।

বুঝুক না বুঝুক বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপিচুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড়ো চটিয়াছে, সে যেন কখনও কোনো অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেয়ো না। উমা বা বতন এলেও নয়। বুঝেছ ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।

কয়েকদিন পরে উমা আর বত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কী যেন একটা ব্রত আছে, কী যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরি আর বিড়ুতির অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিড়ুতিও নয়। মহেশ চৌধুরি শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। প্রত্যেক কোনো আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেয়েদের ব্রত কোনো ঘরের কোণে, গাছের নীচে বা পুকুরঘাটে কীভাবে হয় মেয়েরাই তো ভালো করিয়া জানে ! নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটাব সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ির তিনজনকে নিমন্ত্রণ করিবার কী দবকাব ছিল ?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরি তার কাছে গিয়া বসে। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর বত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে তাবাই মহেশের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিবে। উমা আর বত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সেই জানে অতিরিক্ত কী খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিত মনে কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটিবে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর বত্নাবলী নিশ্চিত মনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, কী খবর মহেশ ?

মহেশ বলে, আশ্চর্য, খবর আর কী ?

মহেশ যেন প্রভু শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

কিছু উপদেশ দেবে না কি ?

কী আর উপদেশ দেব বলুন ?

এই আমার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়—

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ দেবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড়-পর্বতে ওঠে, কত যত্নে কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নীচে পড়ে, পড়বার সময় কোনো কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।

সদানন্দ গভীর হইয়া বলে, পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।

ফুরিয়ে যায় না শুবু হয়, কে তা জানে বলুন ?

আমি জানি। সে সীমার মধ্যে কষ্ট সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম তবে আব কষ্ট কীসের ? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে বোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা কবা এত সহজ !

আত্মহত্যা কবা সহজ ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ ধর্ম রীতিনীতি সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু-চারজন আছে কিন্তু ব্রহ্মচার্য কি সহজ না মানুষের পক্ষে সম্ভব ? আত্মহত্যা দু-চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় পেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না ? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের আবিষ্কার। আসল সাধু কী ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে ? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় কী তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তি কি খাটে ? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটাব যোগ আছে। কোন যুক্তিটা সবচেয়ে বেশি খাটবে কোনটা সবচেয়ে কম খাটবে ঠিক করলে নিবপক্ষে মন নিয়ে জগতেব সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবার নাম সাধনা। এই জন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মনুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্যন্ত এক গ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—

আমি তাই করেছি না ? সদানন্দ বাজা কবিতা জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।

পাপ ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কীসের ?

অনুতাপ যদি না হয় তবে আর পাপ কীসের ? হজম করতে পারলে আর শবীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে রাশি রাশি অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াব আর দোষ কী ! কিন্তু মুশকিল কী জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে বলে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ কবলে যদি আনন্দ হয়, আর একটা কাজ কবলে নিবানন্দ হতে পাবে না ?

সাধাবণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপশেষ হতে না দিলে কেন হবে ?

সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা চাই তো। অনুতাপ হয় এমন কাজ যাবা করে তাদের মনটা কিছুতেই বশ হয় না। অনুতাপ বড়ো ভীষণ জিনিস, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড়ো শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। মাই কবুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এব মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন। অনুতাপ হবেই, তবে মাঝাক রকমেব না হয়। মাঝাক অনুতাপ যাতে হয় তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপব অতাচাব করেন—

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, তার মানে ?

মহেশ শাস্ত্রভাবেই বলে, কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধবে টানাটানি কবেছিলেন কি না, তাই কথাটা বলছি। ও রকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ও জন্য অনুতাপ করা মনের দুর্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলে ও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায হয়নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমনভাবে বদলে দিতে চান যাতে ও রকম পাপ করেও অনুতাপ হব না, তখন বিপদ হবে কী জানেন, যতদিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে মনটা বদলাবে না।

যোগসাধনার মূলনীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোটোবড়ো পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেই জন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া—কবার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কামের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী-ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয়তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাচি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।

গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—

মহেশ মৃদু হাসে, আপশোশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা ? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি ? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, আমার আর কোনো উপায় নেই ?

মনে তো হয় না। তবে তেমন গুবু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ি ফিবিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবীলতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, এ আবার কোন দেশি ব্যাপার, নেমস্তম্ব করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া !

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরিকে খাইতে না দেওয়ার কোনো মানে হয় ?

বড়ো পাজি লোক ওরা।

ছি মা, রাগ করতে নেই। কোনো একটা কাবণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে থেষে আসতাম।

দুজনে এ সব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বউ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধ হয় আশেপাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকালের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড়ো চটিয়া গেল।

সব ব্যাপারে তোমার বড়ো বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম ?

আড়ালে গিয়া শশধরের বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিসফিস করিয়া বলিল, তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই।

মাধবীলতা চূপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

মাধু এল না কেন ?

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল। সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, ও সব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়িঘর বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্নতন্ন কবিতা খানাতল্লাশ করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এ রকম পুলিশের হানা দেওয়া আশ্চর্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয়তো বিভূতির নতুন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সেই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি একটু অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

সত্যি, সত্যি, কিছু আরম্ভ কবেছেন নাকি আবার ? উনি তো মিথ্যে বলবাব লোক নন।

উনিই মিথ্যে বলবার লোক।

পুলিশের লোকটি সন্দিক্ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, বিয়ে-থা করেছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। আর কি ও সব ছেলেমানুষি পোষায় ?

পুলিশের খানাতল্লাশের পব মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কী করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরি লোক ভালো নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

ষোলো

১. পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিভূতি বলিল, দেখলে বাবা তোমার দেবতার কীর্তি ?

মহেশ বলিল, ওর অধঃপতন হয়েছে।

বিভূতি নাক সিটকাইয়া বলিল, ও আবাব ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে ? ও লোকটা চিবকাল ভেতরে ভেতরে এমনই বজ্জাত। সাধে কী ওকে ঘৃষি মেরেছিলাম।

ছেলের সে অপবাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মহেশকে হাতুড়ি দিয়া নিজেকে আঘাত করিতে হইয়াছিল, ব্যাপাবটা সহজে ভুলিবার নয়। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল—

ঘৃষি মেরে লাভ কী হয়েছিল ?

তোমার জন্যে—

আমার কথা বাদ দিয়ে বলো। আমি কিছু না করলেও তোব লাভটা কী হত ? চারিদিকে বিচ্ছিরি একটা কেলেক্কারি বেধে যেত, গাঁয়ের লোক আমাদের মারতে আসত, নিজে তুই বাগেব যন্ত্রণায় ছটফট করতিস—

মহেশের যুক্তিতর্ক কোনোদিনই ভালো করিয়া বিভূতির মাথায় ঢোকে না, তার মনে হয় ছেলেবেলা হইতেই সে যা বলে আর ভাবে মহেশ ঠিক তার উলটো কথাটা বলিয়া আসিতেছে। রক্তটা বিভূতির একটু গরম, ন্যায়অন্যায়ের বিচারবোধ আর কর্তব্যপ্রবণতা বাপের জীবন্ত দেবতার নাকে ঘৃষি মারানোর মতো উদ্ধত, মানুষের চাপে পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায় বলিয়া তার আপশোশের সীমা নাই। তার আদর্শগুলি এমন যে কাজে কিছু করার সুযোগ না পাইলেও কেবল একটা দলে কয়েক মাস মেলামেশা করার জন্যই পুলিশ তাকে কয়েকটা বছর আটকাইয়া রাখিয়াছিল। মনটা যে বিভূতির একটু নরম হইয়াছে, সংসারের অন্যায়গুলির সঙ্গে রফা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে সে যে প্রস্তুত হইয়াছে, মাধবীলতাকে বিবাহ কবিতা সংসারী হওয়াটাই তার প্রমাণ। তবু, মানুষের মন মানে না, কাজে না পারিলে তর্কে নিজেকে জাহির করে।

তুমি বুঝি ভাব, তোমার জন্যে চূপ করে গিয়েছিলাম বলেই আমার রাগ কমে গিয়েছিল ?

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তো কমেছিল।

তুমি আমাকে দিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে, তাতে কখনও রাগ কমে ?

কমে বইকী, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমা চাইলেই মানুষের রাগ কমে যায়। তখন কী মনে হয় জানিস, মনে হয় এবারকার মতো চুলোয় যাক, আবার যদি লোকটা কিছু করে তো দফা নিকেশ করে দেব। আমি জোর করে ক্ষমা চাওয়ালে কী হবে, নিজেব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা তো তোকে সত্যি সত্যি চাইতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর আগের মতো জোরালো রাগ পুষে রাখতে মানুষের বড়ো বিরক্তি বোধ হয়।

বিভূতি বিশ্বাস করিল না। আগেরবারের চেয়েও এবার তার বেশি রাগ হইয়াছিল। তার চলাফেরার দিকে পুলিশ একটু নজব রাখিবে, মাঝে মাঝে বাড়িঘর খানাতল্লাশ করিবে, এ সব বিভূতির কাছে খাপছাড়া ব্যাপার নয়। এতকাল আটক রাখার পর তাকে পুলিশ একেবারে জন্মের মতো তাগ করিবে, বিভূতি নিজেও তা বিশ্বাস করে না। ছাড়া পাওয়ার পর সব সময়েই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া আছে, কখন আবার ডাক আসে। এমনি পুলিশ যাকে বাগে পাওয়ার জন্য ওত পাতিয়া আছে, তাব নামে মিথ্যা করিয়া পুলিশের কাছে লাগানো ! বিভূতির মনে ভয় ছিল, সকলের মনেই এ অবস্থা থাকে, বাগের জ্বালায় তাই তার মনে হইতে লাগিল, ভোঁতা একটা দা দিয়া সদানন্দের গায়ের মাংস কাটিয়া নেয়।

এই অসম্ভব কাজটার বদলে একবার আশ্রমে গিয়া সদানন্দকে একটু ধমক দিয়া আসিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি অনামনস্ক হইয়া থাকে।

রাত্রে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছ ?

বিভূতি বলে, না। কিছু ভাবছি না।

মাধবীলতা গভীর আদবেব সঙ্গে তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলে, বলো না, কী ভাবছ ?

দিনের বেলা মেলামেশা চলে, কিন্তু দিনেব বেলা ভালোবাসাব খেলা মাধবীলতার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে স্বামীব পাওনাগন্ডার বিষয়টা খেয়াল না থাকিলে এমনও হয় যে, ফাঁকতালে একটু সোহাগ কবিতে আসিয়া দু-হাতের জোরালো ঠেলায় বিভূতি চমকিয়া যায়। তখন অবশ্য মাধবীলতাব খেয়াল হয়, মৃদু তিরস্কাবের সুরে সে বলে, কী যে করো তুমি, চান্দিকে লোক রয়েছে না ? ওমা দবজা বন্ধ করে দিয়েছ ! বেশ লোক তো তুমি ? তবু, দিনেররাত্রে সব সময় মাধবীলতাকে নিয়া ঘরের দবজা বন্ধ কবিবার অধিকার জন্মানোব অল্পদিনের মধ্যেই বিভূতি টেব পাইয়া গিয়াছে, দিনেব বেলা মিলনের আনন্দ ভোগ কবার ক্ষমতাটা মাধবীল যেন ভোঁতা হইয়া যায়। ব্যাপারটা তার বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়, কাবণ, রাত্রে মাধবীল তীক্ষ্ণতায় তাকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হইতে হয়, ঘুম পর্যন্ত যেন মাধবীল চলিয়া যায়, বিভূতিব ঘুম আসিলেও তাকে সে ঘুমাইতে দেয় না, প্রাণের চেয়ে যে প্রিয়তব তাকে পর্যন্ত ভালোবাসিতে ভালোবাসিতে শাস্ত হইয়া বিভূতি কিমাইয়া পড়িলে মাধবীলতা অক্লান্ত চেষ্টায় যেভাবে আবার তাকে বাঁচাইয়া তোলে, মানুষের বাস্তব জীবনে যে সে ধরনের অপবূপ কাবোর স্থান আছে বিভূতি কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিভূতি বলে, পুলিশের কথা ভাবছিলাম। আবার যদি আমায় ধরে নিয়ে যায় ?

এক নিমেষে মাধবীলতা বদলাইয়া যায়, বুদ্ধশ্বাসে বলে, মাগো, পুলিশ দেখে আমার যা হচ্ছিল !

পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আরও তিন-চাববার এমনিভাবে সে প্রায় এই কথাগুলিই বলিয়াছে। হঠাৎ একবার বিভূতির মনে হয়, সব কি মাধবীলতার ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, হিস্টিরিয়া ? কিন্তু এই টাইপের খাঁটি ন্যাকামি আর বাড়াবাড়ি আর হিস্টিরিয়া ঠিক কী রকম সে বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় সন্দেহের চোখে মাধবীলতার ভীত চোখ দুটি দেখিতে গিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়। কত জন্ম তপস্যা করিয়া সে এমন বউ পাইয়াছে, কত ভাগ্য তার !

তখন মাধবীলতার ভয় দূর করার জন্য তাকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া জানাইয়া দেয়, আশ্বাস দিয়া বলে যে, সমস্তটাই সাধু সদানন্দের কাবসাজি, সদানন্দ পিছনে না লাগিলে পুলিশ আর তাকে জ্বালাতন করিতে আসিত না। ভয় নাই, মাধবীলতার কোনো ভয় নাই, পুলিশ আর বিভূতিকে ধরিয়ে না, বউকে এমনিভাবে বুকে কবিয়া, বিভূতি তাঁবন কাটাইয়া দিবে।

শুনিয়া, ভয়ে না যত হইবাছিল মাধবীলতার চোখ তাব চেয়ে বেশি রক্তম বিক্ষিপিত হইয়া গেল।
উনি। উনি এমন কাজ করলেন!

কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, পারে, ও লোকটা সব পারে। ওব অসাধ্য কাজ নেই। ওব মতো ভয়ানক মানুষ—

মাধবীলতার ফেণ্ড-দুঃখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার বিভূতির মনে হইল সে যেন বাড়াবাড়ি করিতেছে। ভালোবাসিতে আজ যেন মাধবীলতার ভালো লাগিল না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাববাব সে ওই কথাই আলোচনা কবিতে লাগিল। প্রথমটা কসেক মুহূর্তের জন্য বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তাব বিচলিত ভাব দোঁখিয়া বিভূতি আবার মুগ্ধ হইয়া গেল। কী ভালোই মাধবীলতা তাকে বাসে।

বিভূতির এই কৃতজ্ঞতাই মাধবীলতাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করিয়াছিল। বড়ো সহজে বিভূতির মন ভুলানো যায়। একটু আদবয়ত্ত্ব করা, বুকের সামান্য একটু বিশেষ ভঙ্গি দেখানো, বিভূতির কাছে এ পর্যন্ত যে কত দামি বুঝিতে পারিয়া মাধবীলতা নিজেই অবাক হইয়া যায়! কত সহজে কত গভীর আনন্দ সৃষ্টি ও উপভোগ করা যায় মাঝে মাঝে খেয়াল করিয়া নিজেব অফুরন্ত মন-কেমন-কবাব অভিশাপ তাব যেন অসহ্য ঠেকে। ভয়ানক কিছু, বীভৎস কিছু, প্রচণ্ড কিছুব জন্য কামনা যেন স্বপ্নানুভূতির মতো মৃদু অথচ মানসিক রোগের মতো একটানা হইতে পারে, মাধবীলতার তা জানিবার বা বুঝিবার কথা নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তবঙ্গে উঠিতে-নামিতে তাব প্রাণান্ত হইতে থাকে বলিয়া জীবনের প্রত্যেকটি সংস্কার ও আনন্দের জন্য বিভূতিকে মনে মনে সে প্রায় পূজা করে। বিচলিত ভাবটা যতক্ষণ না বিভূতি অক্ষণ অবশ্য বিভূতিকে বড়ো করার কথাটা তার খেয়ালও হয় না এবং বিচলিত ভাবটা ক্রমশঃ ক্রমিতে মাঝরাত্রি প্রায় কাবাব হইয়া যায়। তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় আপশোশের তাব সীমা থাকে না। বিভূতির কপালে হাতের তালু ধমিয়া দিতে দিতে সে ব্যগ্রকণ্ঠ বলে, না না, তুমি ভেবো না, ও তোমার কিছু করতে পারবে না।

এতক্ষণ পবে নিজেব দেওয়া আশ্বাস ফিবিয়া পাইয়া গভীর ঘুমের আক্রমণ আব বিভূতিকে কাবু কবিতে পারে না, মাধবীলতার গোলামি করার একটা বোমাঞ্চকব সাধ ববং তাকে ছোটো ছেলের মতো লজ্জার হাসি হাসাইয়া দেয়।

তার মাথাটা সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাধবীলতা বলে, তোমাব কিছু হলে আমি মবে যাব।
বিভূতি চুপ কবিয়া পড়িয়া থাকে।

লঠনের বাদামি আলোয় মশাবির ভিতবে ও বাহিরে গভীর বাত্রি রূপ নিয়াছে, লঠনের কাছেব কয়েকটা জিনিস ছাড়া মশাবির জন্য বাহিবের আব কিছু ভালো দেখা যায় না, বন্ডিন কুয়াশায় যেন একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। স্টোভের পাশেই স্পিরিটের বোতলটাব দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আবেগের ভাঙনপ্রবণতার জন্য মাধবীলতার চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে। এমন কোমল কেন বিভূতি, এত বেশি ভাবপ্রবণ আর মমতাময়? এত অল্পে সে সন্তুষ্ট কেন, এত কম সে চায় কেন, এত কম সে নেয় কেন, কেন সে এত বাগ্র শুধু দেওয়ার জন্য? জেল আর ফাঁসির ভয় তুচ্ছ করিয়া সে বুক-কাঁপানো কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, অনায়াসে সে সদানন্দের নাকে ঘুঘি মারিতে পারে, সে যেন মাটির পুতুল, মায়ের কোলের শিশু!

তা হোক। তাই ভালো।

আরও জোরে বিভূতির মাথাটা বৃকে চাপিয়া ধরিয়া জোরেই যেন মাধবীলতা স্পিরিটের বোতলটার দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনে।

ঘুমাবে না ?

তোমার ঘুম পেয়েছে ?

হাতের চাপ একটু আলগা করিয়া মাধবীলতা মৃদু হাসে ; আমার ঘুম দিয়ে কী করবে, আমি তো দিনে ঘুমেই। তোমার ঘুম পেয়েছে কি না তাই বলো।

পরদিন দুপুরে ঘুমানোর বদলে মাধবীলতা শশধরের বউকে সঙ্গে করিয়া সদানন্দের আশ্রমেব উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। গেল প্রতিবেশী মনোহর দত্তের গোরুর গাড়িতে। আশ্রমে যাইবে শুনিয়া মনোহর দত্তের বুড়া মা, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছে গিয়াছে তাড়াতাড়ি নামাবলি গায়ে জড়াইয়া তাদের সঙ্গে নিল।

মনোহর দত্তের বউ দেড়মাসের ছেলে কোলে কবিয়া আপশোশ করিয়া বলিল, আমিও যেতাম বাছা তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু আমার কপালে কী আর ধম্মোকন্মো আছে !

আগে মাধবীলতা শশধরের বউকে কিছু বলে নাই, বাহির হওয়াব একটু আগে কেবল খবরটা দিয়াছিল। শশধরের বউ তো শুনিয়া অবাক।

আশ্রমে যাবে ? সাধুবাবাকে তুমি এত ভক্তি কব তা তো জানতাম না ভাই !

ভক্তি না তোমার মাথা। যাচ্ছি তার মুক্তপাত করতে। আমাদের বাড়িতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়, এমন আশ্পর্ধা !

শশধরের বউ খতোমতো খাইয়া গিয়াছিল, একটু ভয়ও পাইয়াছিল। বলিয়াছিল, বাড়িতে গুঁবা জানতে পারলে কিন্তু বড় রাগ করবেন।

বাবাকে বলে এসেছি।

চুপিচুপি কারও কাছে কিছু না বলিয়া যাইবে অথবা মহেশ চৌধুরি ব অনুমতি নিয়া যাইবে, সমস্ত সকালটা মাধবীলতা আজ এই সমস্যা ব মীমাংসা করিয়াছে। মহেশ চৌধুরি তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে দিতে রাজি হইবে কি না এ বিষয়ে মাধবীলতার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলিয়া যাওয়াই ভালো মনে কবিয়া অনুমতি চাহিতে গিয়া তা ব বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

মহেশ চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া বলিয়াছিল, আশ্রমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মা ? বেশ তো। তারপর হাসিয়া বলিয়াছিল, পুরনো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে ?

মহেশ চৌধুরিই যে সদানন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সদানন্দকে ভক্তি করার বদলে সে যে এখন তার অধঃপতনের জন্য আপশোশ করে, এ সব মাধবীলতার অজানা নয়। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া হাসিমুখে তাকে সদানন্দের আশ্রমে যাইতে অনুমতি দেওয়া মহেশ চৌধুরি মতো মানুষের পক্ষেও মাধবীলতা সত্ত্ব ভাবিতে পারে নাই। সদানন্দের অধঃপতনে বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু তাকে যে সদানন্দ সতাই অপমান কবিয়াছিল মহেশের মনে কি এ বিষয়ে একটু খুঁতখুঁতানিও জাগে নাই ? যে কাণ্ডের ফলে নিজেকে তার হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিতে হইয়াছিল ?

দুপুরবেলা আশ্রমে যে যার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল, উমা ছিল রত্নাবলীর ঘরে। শশধরের বউ আর মনোহর দত্তের মাকে সঙ্গে করিয়া মাধবীলতা প্রথমে সে ঘরে গেল তারপর সঙ্গী দুজনকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া একা দেখা করিতে গেল সদানন্দের সঙ্গে।

রত্নাবলী বলিল, একটু বোসো না ভাই, দুদণ্ড গল্প করি। সেদিন তো কথা বলারই সময় পেলাম না।

সদানন্দের নির্দেশে উমার সঙ্গে মাধবীলতাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া রত্নাবলী একাই প্রায় তিন ঘণ্টা মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিয়াছিল। কিন্তু যে রকম রোমাঞ্চকরভাবে মাধবীলতার বিবাহ হইয়াছে তাতে দু-চারঘণ্টার গল্পে কি মনের কথা সব বলা হয় ?

মাধবীলতা বলিল, না ভাই, চট করে আগে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে বডড চটে আছেন।

তুই কী করে জানলি চটে আছেন ?

ওকে চিনি না আমি ?

সদানন্দের মহলে ঢুকিতে গিয়া আগে দেখা হইল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন তাকে দেখিয়াই বলিল, কী সর্বনাশ, তুমি এখানে !

ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কেন ?

আমার দরকার আছে।

কী দরকার ?

আছে।

বিপিন খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, সেদিন তোমাকে অত করে বুঝিয়ে বলে এলাম—

মাধবীলতার নিজেরও বৃকের মধ্যে অকথ্যরকমের টিপটিপ করিতেছিল, তবু সে মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, আপনার ভয় নেই, উনি আমার কিছু করতে পারবেন না। আপনার যত সব উদ্ভট ধারণা—উনি সে রকম মানুষ নন।

ইতিমধ্যে বিপিন একটু আত্মসংবরণ করিয়াছিল, সে গম্ভীর মুখে বলিল, আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চলো তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

কেন ?

কেন আবার কী ? আমার আশ্রমে আমি যদি তোমায ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়েব জোরে ঢুকবে ?

কথা হইতেছিল সদানন্দের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মাধবীলতার গলা শুনিয়া সদানন্দ আগেই দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া দুজনের কথা শুনিতোঁছিল, এবার ডাকিয়া বলিল, এসো মাধু, ভেতরে এসো। বিপিন তুমি একটু বাইরের দরজার কাছে বসোগে যাও তো, কেউ এসে আমাদের বিরক্ত না করে।

আগাইয়া আসিয়া বিপিনের চোখের সামনে মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সদানন্দ তাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল, বিপিনের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল দরজা।

মাধবীলতার আর্দকণ্ঠেব চিৎকার শোনা গেল, বিপিনবাবু ! ও বিপিনবাবু ! তারপর স্পষ্টই বুঝা গেল সদানন্দ তার মুখে হাত চাপা দিয়াছে।

দরজার কাছে সরিয়া গিয়া বিপিন চাপা গলায় বলিল, সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না ? দরজা খুলে দে—কে ছেড়ে দে।

সদানন্দ ভিতর হইতে বলিল, কেন ভাবছিস তুই ? কিছু হবে না, তোর কোনো ভাবনা নেই। যদি হয়, তোর বোকামির জন্যে হবে।

তোর পায়ে পড়ি সদা—

পায়ে পড়িস আর যাই করিস কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মতো কেন সময় নষ্ট করছিস, একজন কেউ এসে পড়লে ভালো হবে ? এই সোজা কথাটা তুই বুঝতে পারছিস না

নছাব, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারও কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে মাধুর উপায় থাকবে না ?

বিপিন জানিত মানুষটা সদানন্দ ভয়ানক, কিন্তু এতটা সেও ভাবিতে পারে নাই। এর চেয়ে ঢের বেশি অমানুষিক কাণ্ড সর্বদাই সংসারে ঘটে কিন্তু নিজের সামনে না ঘটা পর্যন্ত নিজের জানাশোনা মানুষের সম্বন্ধে কে তা সম্ভব ভাবিতে পারে ! বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সদানন্দ যা বলিতেছে তাই করাই হয়তো ভালো, তা ছাড়া আর কী উপায় আছে !

ভিতর হইতে সদানন্দ বলিল, বিপিন, গেলি ?

বিপিন বলিল, যাচ্ছি।

ধীরে ধীরে বিপিন সদরের দরজার দিকে আগাইয়া যায়, মাথার মধ্যে তার যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে থাকে। দরজা বন্ধ না করিয়া খোলা দরজার সামনেই সে বসিয়া থাকে। মাথার মধ্যে তার যত গোলই পাকাইয়া যাক, এ বুদ্ধিটার তার থাকে যে দবজা বন্ধ করার চেয়ে দবজা খুলিয়া রাখিয়া নিজে বসিয়া সকলের পথ আটকানো ভালো।

আশ্রমের একজন সামনে দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করে, এখানে বসে আছেন ?

এমনি। উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন---আমারও একটু দরকার আছে ওনা ব সঞ্জো।

বেলা পড়িয়া আসে, সামনে দিয়া আশ্রমের শিষ্য-শিষ্যার যাতায়াত বাড়িয়া যায়। কেউ কেউ বিপিনকে এখানে এ ভাবে বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কেউ দুদণ্ড দাঁড়াইয়া বাজেকথা বলিয়া যায়। চালার নীচে নিত্যকার সভার জন্য গ্রামবাসী নরনারী একে একে আসিয়া জমা হইতে থাকে। তৃষ্ণায় বিপিনের বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল যে খাইয়া আসিবে সে সাহসও হয় না, কাউকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলিতেও ভবসা পায় না।

শেষ বেলায় চালার নীচে সকলে সমবেত হইয়া অধীব আগ্রহে যখন সদানন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে, উমা আর রত্নাবলী শশধরের বউকে সঙ্গে করিয়া মাদীবলতাব খবন নিতে আসিল।

বিপিন পাংশু মুখে বলিল, উনি মাধুর সঙ্গে কথা বলছেন।

এখনও কথা বলছেন ! রত্নাবলী বলিল।

বিপিন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, মাধুকে উনি একটু বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, অনেকবার আমায় বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে মাধুকে কিছু বলবেন। সে সব কথা বলছেন বোধ হয়।

রত্নাবলী বলিল, এতদিন এক বাড়িতে থেকে বললেন না, এখন---

বিপিন বলিল, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলে কাঁ হবে ? উনি অ্যাঁদিন ইচ্ছে কবেই কিছু বলেননি। আজ মাধু নিজে শুনতে চাইল---

আমরাও একটু শুন আসি বলিয়া রত্নাবলী ভিতরে ঢুকিয়া যায়, বিপিন বাস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, না না, যোয়ো না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু রত্নাবলীকে আটকাইবার মতো গায়ের জোর বিপিনের ছিল না, তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রত্নাবলী ভিতরে চলিয়া গেল।

রত্নাবলীর মনটা একটু সন্দ্বিগ্ন।

সদানন্দের ঘরের সামনে রত্নাবলী একটু দাঁড়াইল। সন্দ্বিগ্ন মনে সাহস থাকে না, থাকে কৌতূহল। দরজা বন্ধ না খোলা ? ঠেলা দিলেই যদি খুলিয়া যায় ? সদানন্দ দরজা খুলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, কী চাই ? বিপদ হিসাবে কোনোটাই কম নয়।

সাহস যে মনে নাই, কৌতূহল দমন করার মতো মনের জোর সে মন কোথায় পাইবে ? দরজাটা ভেজানোই ছিল।

সদানন্দ খাটে বসিয়া আছে, পা ঝুলাইয়া। দুপাশে হাতেব তালু দিয়া খাটে চাপ দিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় হাতের উপরেই শরীরের ভার দিয়া যেন সদানন্দ বসিয়াছে। মাধবীলতা বসিয়াছে মেঝেতে তার ঝুলানো পায়ের কাছে, উর্ধ্বমুখী, উত্তেজিতা, শব্দময়ী মাধবীলতা। উপদেশ দেওয়ার কথা সদানন্দের, কিন্তু সে রীতিমতো অস্বস্তির সঙ্গে মাধবীলতার বক্তৃতা শুনিতোছে।

সদানন্দের চোখে না পড়িলে রত্নাবলী হয়তো চোরের মতো পলাইয়া যাইত, সদানন্দ তাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসায় সে সুযোগটা আর পাওয়া গেল না।

এসো রতন।

মাধবীলতা মুখ নামাইয়া ভালো করিয়া গা ঢাকিয়া কুঁজো হইয়া বসিল। পায়ে পায়ে আগাইয়া আসিয়া রত্নাবলী তার কাছে বসিল, সন্তর্পণে। মনের মধ্যে তার ওলটপালট চলিতেছিল। অবস্থা-বিশেষে কত রকম সন্দেহই মনে जाগে।

তুমি একা এসেছ রতন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবাব—

দেখে আসি ওবা কী কবছে ? সদানন্দ হাসিল। রত্নাবলীর বিব্রত ভাব দেখিয়া আবার বলিল, বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মার্বাই না গায়ে ছাঁকা দিচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিলে না, কেমন ? আশ্রম ত্যাগ কবাব জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না বতন। যাব গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছা আশ্রম ছেড়ে চলে যোয়া, আমি কিছু বলব না।

সত্যমিথ্যায় জড়ানো কথা, না-চাওয়া কৈফিয়তের মতো। সদানন্দের ভাবটা যেন নতুন জামাইয়ের মতো, শালিব সঙ্গে ফাজলামি করিতেছে। রত্নাবলী কিছুই বুঝিতে পারে না, কারণ, বুঝিবাব মতো কী যেন একটা জ্ঞান মনের অন্ধকার তলা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চাকা লাগা নোংরা কিছুব মতো পাক খাইয়া নীচে তলাইয়া যায়। সে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সকলে চূপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? মাধবীলতা তাই বলে, এবাব থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।

তাবপর আবার তিনজনেই চূপ করিয়া থাকে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। একটু পবেই বিপিন আসিয়া গভীর মুখে খবর দেয় যে, চালার নীচে বসিয়া আসিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। সদানন্দ যদি না যায়, বিপিন তাদের খবরটা দিতে পারে।

চলো যাচ্ছি। সদানন্দ যেন একটু ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল।

তাবপর দুজনে চূপচাপ বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ। শেষে মাধবীলতাই বলে, এখানে বসে থেকে কী হবে, চলো আমবাও যাই।

আশ্রমে থাকবে নাকি আজ ?

থাকবাব কী উপায় আছে ভাই ? তোমার ঘরে বসে নিরিবিলি দুদণ্ড কথা বলি গে চলো।

রত্নাবলীর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন পাক খাইয়া বেড়াইতেছিল, সে খানিক খানিক জানে কিন্তু সব জানে না। সব তাকে জানানো শব্দ নাই বলিয়া অভিমানে প্রশ্নগুলি গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল। তবে জানার সাধটা জোরালো হইলে প্রায় সব মেয়েরাই খুকখুক করিয়া একটু কাশির ধাক্কাতেই দাবুণ অভিমানের বাধা ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে। জিজ্ঞাসা তাই হয় আকস্মিক।

হঠাৎ এলে যে ?

হঠাৎ এলাম ? ও, হঠাৎ কেন এলাম ? এমনি এলাম আর কী।

এমনি এলে না তোমার মাথা এলে। ছি, ধিক তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, ঘরের বউ সাজতে গেলি কেন ? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল ?

একজন সেধেছিল ভাই।

ফাঁকি দেওয়া হাসি হাসি ভঞ্জির সঙ্গে হালকা কথা রতনকে রাগে যেন অঙ্কার দেখাইয়া দেয়। আশ্রমের মানুষ-দেবতার পূজার জন্য কোন গ্রামের কে যেন কী উপলক্ষে এক বোঝা নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিল, আশ্রমের সকলেই ভাগ পাইয়াছে। ক্রুদ্ধ চোখে চাহিতে চাহিতে রত্নাবলী বন্ধুর জন্য একটা পাথরের থালায় ফলমূল আর মিস্তান্ন সাজাইতে থাকে। সন্দেহটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না জানিলেও মানুষের বড়ো বড়ো ভাবপরিবর্তনের মধ্যে মনের পরিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। ভদ্রগৃহস্থের ছেলের সঙ্গে সামাজিক বিবাহের ফলে জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি যার কাছে এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রায় মুচকি একটু হাসি পর্যন্ত অন্যায়া মনে হইত, বন্ধুর এ রকম সাংঘাতিক জেরার সময় সে যদি এমন শয়তানি ভরা ফাজলামি করিতে পারে, কিছু একটা ঘটিয়াছে বইকী। হায়, মাঝখানে কিছুদিনের ছেদ পড়িয়া সদানন্দের সঙ্গে আবার কি মাধবীলতার আগের সম্পর্ক পাতানো হইয়া গেল ?

খা।

তুইও বোস ভাই, দুজনে একসঙ্গে খাই ?

এতক্ষণে, মাধবীলতা যখন এক টুকরা ফল মুখে তুলিতেছে, রত্নাবলীর নজর পড়িল, মাধবীলতার ডান হাতের কজির কাছটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

হাতটা প্রায় ভেঙে গেছে ভাই, গায়ে কী জোর মানুষটার !

চিবানো ফলের সঙ্গে ঢোক গিলিয়া রত্নাবলী ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, কেন, এত জোরে হাত ধরল কেন ?

মাধবীলতা হাসিয়া বলে, রাগের চোটে, আবার কেন।

তারপর ?

তারপর আবার কী ? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি আরম্ভ করে দিল।

মাধবীলতা তৃপ্তির হাসি হাসে।

সতেরো

সত্য কথা বলিতে কী, মাধবীলতা কটমট করিয়া তাকানোর অবসর বেশিক্ষণ পায় নাই। অবসর পাইলেও সে তাকানিতে বিশেষ কোনো কাজ হইত কি না সন্দেহ। মুর্ছার উপক্রম হইলে যেমন হয়, মাথাটা সেই রকম বোঁ বোঁ করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করায় সে চোখ বুজিয়া মুর্ছা গিয়াছিল। সদানন্দের চোখ মুখ দেখিয়া সে যেমন ভয় পাইয়াছিল, অঙ্কার রাগে হঠাৎ ভূত দেখিলেও সে রকম ভয় পাইত কি না সন্দেহ। তার মুখের সেই বীভৎস ভঞ্জি আর চোখের মারাত্মক দৃষ্টির মধ্যে পাশবিক কামনার একটু চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মাধবীলতা হয়তো মুর্ছার চরম শিথিলতা আনিয়া সদানন্দের আলিঙ্গনে গা এলাইয়া দিত না, আলিঙ্গন আর একটু জোরালো হইলেই সে দেহের কয়েকটা পাঁজর নির্ঘাত মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যাইত। মাধবীলতা নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছিল, সদানন্দ তাকে খুন করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই হোক অথবা অকথ্য যন্ত্রণা দিবার পরেই হোক। খবরের কাগজে যে সব খুনের খবর বাহির হয়, সোজাসুজি সেই রকম অভদ্র অমার্জিত হত্যা, উপন্যাসের পাষণ্ডেরা যে রকম রসালো খুন করে সে রকম নয়।

মাধবীলতার ভয় পাওয়ার আর একটা কারণ ছিল।

সদানন্দ তখন মহেশ চৌধুরির বাড়িতে, তাকে নূতন আশ্রমে সরানোর আয়োজন চলিতেছে। একদিন হঠাৎ নির্জন বারান্দায় সদানন্দের সামনে পড়িয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে, সদানন্দ ডাকিয়া বলিয়াছিল, একটা কথা শোনা মাধু।

মাধবীলতা কথা শুনিতো দাঁড়ায় নাই। তখন তীব্র চাপা গলায় সদানন্দ বলিয়াছিল, একদিন তোমায় হাতে পেলে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

তখন কথাটার দাম ছিল না। আজ মুর্ছা যাওয়ার আগে মনে হইয়াছিল, সদানন্দের পক্ষে ও কাজটা অসম্ভব কী ?

বিভূতি জিজ্ঞাসা করে, কেন গিয়েছিলে ?

মাধবীলতা জবাব দেয়, তোমার পেছনে কেন পুলিশ লেলিয়ে দিল ?

মাধবীলতার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, জাগিয়া আছে তবু ঘুমোই দু-চোখ বুজিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ভরা আর্তনাদ গুনগুনানো গানের মতো মৃদু চাপা সুবে গুমরাইতেছে। কী হইয়াছে ? কেন হইয়াছে ? কোথায় হইয়াছে ? কবে হইয়াছে ? কিছুই যেন মনে নাই। অবসাদের যন্ত্রণা যে এমন বৈচিত্র্যময় সকলেই তা জানে, তবু সকলের পক্ষেই 'এটা কে তা স্মৃতি'র পর্যায়ের।

[লেখকের মন্তব্য : কেউ বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আব দুর্নীতির মূলভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটিমাত্র নিয়মে। অবশ্য, মানুষের ভুল কবা স্বভাব কি না, তাই এমন একটা সোজা নিয়ম মানিয়া জীবনের রীতিনীতি স্থির করিতে গিয়াও কত যে ভুল করিয়াছে তার সংখ্যা নাই।

মাধবীলতার তৃপ্তি উবিয়া যায় নাই, অবসাদের যন্ত্রণাব নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে মাত্র। এটা অনুতাপ নয়।]

সে রাতে আব বেশি ভেবা কবা গেল না। কাল বিড়বিড় করিয়া কয়েকটা ভাঙা ভাঙা দুর্বোধ্য কথা বলিতে বলিতে মাধবীলতা ঘুমাইয়া পড়িল। পরা : সে অনেক কথাই বলিল বটে কিন্তু বিভূতি ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কারণ মাধবীলতার অনেক কথার মানোটা দাঁড়াইল সেই একই কথায়, সে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া আসিয়াছে বিভূতির পিছনে আর যেন সদানন্দ পুলিশ না লাগায়। কথাটা জটিলও নয়, দুর্বোধ্যও নয়, তবু বিভূতির মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতা যেন একটা খাপছাড়া কাজ করিয়া ব্যাখ্যা আর কৈফিয়তের বদলে একটা হেঁয়ালি রচনা করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধবীলতা একদিন যার বিবুদ্ধে তার কাছে নালিশ করিয়াছিল আর সে যাকে গিয়া মারিয়াছিল ঘৃষি, এতকাল এক বাড়িতে আর বাড়ির কাছে আশ্রমে থাকার সময় যে মাধবীলতা তার ধারে কাছে ঘেঁষে নাই। এখন বলা নাই কওয়া নাই এত দূর আশ্রমে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আসিল সে যেন বিভূতির পিছনে আর পুলিশ না লেগাইয়া দেয় ! কচিখুকি তো সে নয় যে এটুকু জ্ঞান তার নাই, এ ভাবে তার সদানন্দের হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না ? তার ভালোর জন্য গিয়াছিল ? তার বিপদের ভয়ে দিশেহারা হইয়া ? কথাটা ভাবিতে ভালো লাগে কিন্তু বিশ্বাস যে করা যায় না ! দিশেহারা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না সে আবার কোন দেশি সৃষ্টিছাড়া প্রেম, সে প্রেম মাধবীলতা পাইলই বা কোথায় ? তা ছাড়া দিশেহারা আতঙ্কের আর কোনো লক্ষণ তো তার মধ্যে দেখা যায় নাই।

মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল বিভূতির বলিবার নয়। আটক থাকার সময় প্রায়ই যেমন মনে হইত সব ফাঁকি আর সব ফাঁকা, কাঁটা বিছানো বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করাটাই জীবন আর মেশানো আলো-অন্ধকারের আবছা অর্থহীন উপমার মতো স্মৃতি-কল্পনা আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের খিচুড়ি পাকানো ভেঁতা অনুভূতিগুলির মাথার মধ্যে মাথাধরার মতো টিপটিপ করাটাই বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অভিযুক্তি, আজ তেমনই মনে হইতে লাগিল, মাধবীলতাও যে তার আপন নয় এই সত্যটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হওয়াটাই তাকে আপন করিতে চাওয়ার একমাত্র সম্ভবপন পরিণতি। আটক থাকার সঙ্গে মাধবীলতা আপন নয় ভাবার পার্থক্য অনেক, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা এক রকম কেন, এই দার্শনিক সমস্যাটা মনে উদয় হওয়ায় বিভূতি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল এবং সকল অবস্থার সুখদুঃখ একই রকম কি না এই কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করায় আধঘণ্টার মধ্যে ঘটয়া গেল স্নায়বিক বিপর্যয়। তখন, মৃদুস্বরে সে ডাকিল, মাধু ?

আজ অগসাদ কমিয়াছে, কারণ বিভূতির রকম-সকম দেখিয়া অল্প অল্প ভয়ের উত্তেজনা আসিয়াছিল। ঘুম তাই একেবারেই আসে নাই। ঘুমের ভানে মাধবীলতা এমনভাবেই সাজা দিল যে পরমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে বিভূতি তাকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু কী মৃদু আর সশঙ্কসে আলিঙ্গন, পাঁজর যদি মাধবীলতার পাটখাড়ির হইত তবু ভাঙিবার কোনো ভয় ছিল না।

অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেলে হযতো আবার একদিন আশ্রমে যাওয়ার সাধটা মাধবীলতাব অদমা হইয়া উঠিত কিন্তু কয়েকটা দিন কাটিবার আগেই একদিন মহেশ চৌধুরি বলিল, চলো মা একবাব আশ্রম থেকে ঘুরে আসি।

না গেলেও চলিত, খুব বেশি ইচ্ছাও ছিল না যাওয়ার, তবু মাধবীলতা স্বশরীরের সঙ্গে আশ্রমে বেড়াইতে গেল। তখন সকালবেলার মাঝামাঝি, আবহাওয়া অতি উত্তম। এক বছর সদানন্দেব উপদেশ শোনার চেয়ে এক বছর আশ্রমে পায়চারি করিলে প্রকৃতির প্রভাবেই মনের বেশি উন্নতি হয়। মহেশ চৌধুরিকে একটু চিন্তিত দেখাইতেছিল। চিন্তা মহেশ চৌধুরি চিবকালই করিয়া থাকে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে এখন তার মুখের ছাপটা দুর্ভাবনার। কী হইয়াছে কে জানে !

গাছতলায় আশ্রমের সকলে সদানন্দকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে শিষ্যবেষ্টিত ঋষির ছবি যার কল্পনায় আছে, দেখিলেই তার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহেশ চৌধুরি ভুবু কঁচকাইয়া বিস্ময়ের সঙ্গে চাহিয়া থাকে আর মৃত্যুর মধ্যে জীবনের কতখানি শেষ হইয়া যায় সকলকে তার হিসাব বুঝাইতে বুঝাইতে হাসিমুখে সদানন্দ মাথাটা হেলাইয়া তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মাধবীলতা রত্নাবলীর কাছে গিয়া বসে আব সদানন্দের ইঞ্জিত উপেক্ষা করিয়া মহেশ চৌধুরি বসে সকলের পিছনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায় একমনে সে সদানন্দের কথা শুনিতোছে, অসম্ভব কিছু সম্ভব হইতে দেখিবার বিস্ময়ের সঙ্গে।

অন্য সকলের, পুরুষ ও নারীদের বিস্ময় নাই। সকলে মুগ্ধ, উত্তেজিত। কথা শেষ করিয়া সদানন্দ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে একা নদীর দিকে আগাইয়া যায়। যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ক্ষণকালের স্তব্ধতার শেষে শুরু হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আত্মসমর্পিত মনের সার্থকতার আনন্দ যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মতো প্রাঞ্জল মনে হয়। অন্তত মহেশের যে মনে হয় তাতে সন্দেহ নাই, কারণ সে আরও বেশি খতোমতো খাইয়া সদানন্দের গতিশীল মূর্তির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

রত্নাবলীর সঙ্গে তার কুটিরে যাওয়ার আগে মাধবীলতা তাকে খবরটা দিতে আসিল, ফিরিবার সময় যাতে তাকে খোঁজ করার হাঙ্গামা না বাঁধে।

মহেশ চৌধুরি বলিল, আমরা আজ এখানে থাকব মাধু।

সারাদিন ?

সারাদিন তো বটেই, সারারাতও থাকতে পারি।

মাধবীলতা। এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণটা জানিবার চেষ্টা আরম্ভ করার আগেই মহেশ চৌধুরি উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ তখন চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তার দেখা না পাইয়া মহেশ চৌধুরি অবশ্য বৃষ্টিতে পারিল যে নদীর দিকের খিড়কি দবজা দিয়া সদানন্দ কুটির ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজে সে কুটির চুকিল না। রত্নাবলীর কুটিরে ফিরিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বলিল, ওঁকে একবার ডেকে আনো তো মাধু।

মাধবীলতা অবাক। ডেকে আনব ? এখানে ?

হ্যাঁ। বলো গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

মহেশ চৌধুরি হুকুম দিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখা করিবে সদানন্দের সঙ্গে। প্রতিবাদ করিতে গিয়া কিছু না বলিয়াই মাধবীলতা চলিয়া গেল। হঠাৎ তাব মনে পড়িয়া গিয়াছিল মহেশ চৌধুরির পাগলামির মানে বৃষ্টির ক্ষমতা এতদিন এক বাড়িতে থাকিয়াও তার জন্মে নাই।

প্রায় একঘণ্টা পরে, রত্নাবলী যখন ব্যস্ত আর বিব্রত হইয়া বারবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাব একবার গিয়া খোঁজ করিয়া আসা উচিত, মাধবীলতা ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বলিয়া পাঠাইয়াছে, দেখা করিবার দরকার থাকিলে মহেশ চৌধুরি যেন সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসে। শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, চলো আমরা ফিরে যাই মাধু।

সাবাদিন এখানে থাকবেন বলেছিলেন যে ?

আর থেকে কী হবে ? ভেবেছিলাম মানুষটা বৃষ্টি হঠাৎ বদলে গেছে, কিন্তু মানুষ কী কখনও বদলায় ?

মানুষ যে বদলায় না, তার আর একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ পাওয়া গেল ফিরিবার পথে। চরডাঙা গ্রামের কাছাকাছি মস্ত একটা মাঠে পঁচিশ-ত্রিশজন অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বিভূতি নিষেধ করিতেছে। মুখে ফেনা তুলিয়া এমনভাবে নিষেধ করিতেছে যেন কোনো বকমে এই লক্ষ্মীছাড়া বোকা মানুষগুলোকে কথটা একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তারা হত্যা করিবে তবু আর এ ভাবে আত্মহত্যা করিবে না।

একসঙ্গে খাইতে বসিয়া মহেশ চৌধুরি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, আবার কি তুমি জেলে যেতে চাও ?

সাধ করে কেউ জেলে যায় ?

বিভূতির মেজাজটা ভালো ছিল না।

অমন করে ওদের খেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা ? একটু কিছু ঘটলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

নেয় নেবে।

মহেশ চৌধুরি ডালমাথা ভাত খায় আর ভাবে। বুঝাইয়া কোনো লাভ হইবে না। এই কথাটাই অনেকবার অনেক ভাবে ছেলেকে সে বুঝাইয়াছে যে, অকারণে জেলে গিয়া কোনো লাভ হয় না, সেটা নিছক বোকামি—কাজের মতো কোনো কাজ করিয়া ছেলে তার হাজারবার জেলে যাক, হাজার বছরের জন্য জেলে যাক মহেশ চৌধুরির তাতে তো কোনো আপত্তি নাই ! কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো দেশ আর দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য চোখ কান বুজিয়া জেলে যাওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। মনে হইয়াছিল, বিভূতি বৃষ্টি কথটা বৃষ্টিতে পারিয়াছে—বিভূতি চুপচাপ শুনিয়া গিয়াছে, তর্কও করে নাই, নিজের মতামত জাহির করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ আবার মহেশ চৌধুরির মনে হইতে লাগিল, অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া সে শুধু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এড়াইয়া চলিয়াছিল, কথাগুলি তার মাথায় ঢোকে নাই।

একবার টোক গিলিয়া মহেশ চৌধুরি এক চুমুকে জলের গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করিয়া ফেলিল। ছেলেও যদি তার সহজ সরল কথা না বুঝিয়া থাকে—

অথবা এ সব কথা বুঝিবার নয় ? মানুষ যা করিতে চায় তাই করে ?

অল্প দূরে মহেশের পোষমানা বিড়ালটি ঘুপটি মারিয়া বসিয়াছিল। মাছের ঝোল পবিবেশন করিতে আসিবার সময় বেচারির লেজে কী করিয়া মাধবীলতার পা পড়িয়া গেল কে জানে, চমক দেওয়া আওয়াজের সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া মাধবীলতার নতুন শাড়িখানি আঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিল। মাছের ঝোলের খালাটি মাটিতে পড়িয়া গেল, বিড়ালটির মতোই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়া পিছু হটিতে গিয়া মাধবীলতা ধপাস কবিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল—পা ছড়াইয়া বসিবার ভঙ্গিতে। গায়ে তার আঁচড় লাগে নাই, পড়িয়া গিয়াও বিশেষ ব্যথা লাগে নাই কিন্তু চিৎকার শুনিয়া মনে হইল তাকে বুঝি বাঘে ধরিয়াছে।

কাঠের মোটা একটা পিঁড়ি কাছেই পড়িয়াছিল, দু-হাতে পিঁড়িটা তুলিয়া নিয়া এমন জোরেই বিড়তি বিড়ালটিকে মারিয়া বসিল যে মরিবার আগে একটা আওয়াজ করার সময়ও বেচারির জুটিল না।

সকলের আগে মহেশ চৌধুরির মনে হইল তার পোষমানা জীবটি আর কোনোদিন লেজ উঁচু করিয়া তার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে খড়খড় আওয়াজ করিবে না। তারপর অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল।

জটিল, খাপছাড়া সব রাশি রাশি কথা—চিন্তাগুলি যেন ছেঁড়া কাগজের মতো মনের ঘবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এলোমেলা উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ রকম অবস্থায় মহেশ চৌধুরি কথা বলে না। তা ছাড়া আর উপায় কী আছে ? এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে বিচাব-বিবেচনার পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত দিয়া না বুঝিলে মনের ভাব আর প্রকাশ কবা যায় না। আত্ম-বিরোধী মত যদি কিছু প্রকাশ করিয়া বসে ? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল তা অবশ্য মহেশ চৌধুরি কখনও ভাবিয়া দেখে নাই, তবে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আত্মরক্ষী জীবমাত্রেরই ভয় করে! নিজের সুখদুঃখের পরের সুখদুঃখের মুখাপেক্ষী করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তার একমাত্র বর্ম। রাগে দুঃখে অভিমানে বিচলিত হওয়া মহেশ চৌধুরির পক্ষে সম্ভব কিন্তু উচিত কী অনুচিত না জানিয়া পোষা একটা বিড়ালকে মারাব জন্য বিড়তিতে চড় চাপড়টা মারিয়া বসাও সম্ভব নয়, গালাগালি দেওয়াও সম্ভব নয়।

কয়েকবার টোক গিলিয়া মহেশ চৌধুরি একেবারে চূপ করিয়া যায়। অন্য বিষয়েও একটি শব্দ আর তার মুখ দিয়া বাহির হয় না। খাওয়াও তখনকার মতো শেষ হয় সেইখানে।

বিস্মারিত চোখে খানিকক্ষণ মরা বিড়ালটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাধবীলতা প্রমথ ভয়ে ভয়ে কথা বলে, কেন মারলে ? কী নিষ্ঠুর তুমি !

যেখানে যেখানে আঁচড়ে দিয়েছে, আইডিন লাগিয়ে দাও গিয়ে।

আঁচড় লাগেনি।

কথাটা বিড়তি সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। একটুও আঁচড় দেয় নাই ? একেবারে না ? কী আশ্চর্য ব্যাপার ! তবে তো বিড়ালটাকে না মারিলেও চলিত। বোকার মতো একটু হাসে বিড়তি, মড়া বিড়ালটার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া নেয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিস্ময়ে নয়, ব্যথা লাগে না এমন কোনো আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে। মহেশ চৌধুরির নির্বাক থাকার চেয়ে বড়ো সংযম যেন বিড়তির দরকার হইতেছে শুধু সহজ নির্বিকার ভাবটা বজায় রাখিতে। বিচলিত হওয়ার উপায় তো বেচারির নাই। মনের কোমল দুর্বলতা যদি প্রকাশ পাইয়া

যায় ? সেটা প্রায় সর্বনাশের শামিল। কেন সর্বনাশের শামিল তা অবশ্য বিভূতি কখনও ভাবিয়া দ্যাখে নাই, তবে অন্যান্য-বিরোধী মানুষ মাঝেই নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে চায়। পরের দুঃখ কমানোর জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করার নীতি যাকে মানিয়া নিতে হয়, অস্বাভাবিক সংযম তারও একমাত্র বর্ম। অনুতাপে খতোমতো খাইয়া যাওয়া বিভূতির পক্ষে সম্ভব কিন্তু স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য তুচ্ছ একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাকর বিড়ালের দেহটা তুলিয়া নিয়া যায়, বিভূতি আবার খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে সে আত্মসংবরণ করিতে থাকে। আত্মসংবরণ কবিত্তে সময় তার বেশিক্ষণ লাগে না, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধবীলতা যখন আজ শশধরের বউয়ের সঙ্গে গল্প করার বদলে পান হাতে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বিভূতির মন তখন কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গাঢ় আব আঠার মতো চটচটে তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। দুপুরটা সেদিন দুজনের গভীর আনন্দে কাটিয়া গেল। পুরুষ আব নারীর প্রথম যৌবনের সব দুপুর ও রকম আনন্দে কাটে না।

বিভূতির মা ঘরে যায় দুধেব বাটি হাতে। মহেশ এক রকম কিছুই খায় নাই।

খাও।

মহেশ কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে। কিন্তু শুধু মাথা নাড়িয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে কে কবে ঠেকাইতে পারিয়াছে ? শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়, কেন জ্বালাতন করছ ? এখন কিছু খাব না।

কেন খাবে না ?

বিভূতির মার নিজেরও খাওয়া হয় নাই, ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতেছিল আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মহেশ যখন সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেয় যে, মনেব উত্তেজনার সময় খাইলে শরীর খারাপ হয়—বিভূতিব মাব মেজাজ বীতিমতো গরম হইয়া উঠিয়াছে।

কচি খোকার মতো কী যে করে! তুমি !

ভালো করিয়া কথা বলিলে, এমনকী বীতিমতো ঝগড়া করিলেও হয়তো বিভূতির মা তখনকার মতো শুধু রাগে গবগর কবিত্তে করিতে চলিয়া যাইত, এক ঘণ্টা পবে আবার ফিরিয়া আসিত দুধের বাটি হাতে। কিন্তু এ ভাবে কথা পর্যন্ত বলিতে না চাইলে কি মানুষের সহ্য হয় ? বিভূতির মা তো আব জানিত না, নিজের মনের সঙ্গে মহেশ বুঝাপড়া করিতেছে, কত যে বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে তার সীমা নাই। খোলা দরজা দিয়া দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিভূতির মা আগাগোড়া একটা বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল।

তখন মনটা মহেশ চৌধুরির বড়ো খারাপ হইয়া গেল। কী দোষ করিয়াছে বিভূতির মা ? অন্যের পাপে সে কেন কষ্ট পায় ? সেদিনের কথা মহেশের মনে পড়িতে থাকে, সদানন্দের কুটিরের সামনে তার সঙ্গে বিভূতির মা যখন গাছতলায় বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। বিছানার একপ্রান্তে পা গুটাইয়া বসিয়া মহেশ ভাবিতে থাকে। বিভূতির মাকে তুলিয়া খাওয়ানো যায়, সেটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কী লাভ হইবে ? বিভূতির সম্বন্ধে যা সে ভাবিতেছে তাই যদি স্থির করিয়া ফেলে, তখন বিভূতির মাকে যে কষ্টটা ভোগ করিতে হইবে তার তুলনায় এখনকার এ কষ্ট কিছুই নয়।

বিভূতিকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে কি না, এই কথাটাই মহেশ ভাবিতেছিল। বিড়াল মারার জন্য নয়, বিভূতির প্রকৃতি যে কখনও বদলাইবে না এটা সে ভালো করিয়া টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া। এখন বিভূতিকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়ার অর্থই কি তাকে সমর্থন করা নয় ? শুধু ছেলে বলিয়া তাকে আর কি ক্ষমা করা চলে, চোখ কান বুজিয়া আর কি আশা করা চলে এখনও তার সংশোধন সম্ভব ? বিনা প্রতিবাদে এখন চূপ করিয়া থাকা আর বিভূতিকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া যে সে যা ঋণি করিতে পারে, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তার ছেলে বলিয়া বিভূতির অন্যান্য

করার যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, মানুষের উপর যে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বিভূতিকে জানিয়া শুনিয়া সে সমস্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া আর তাব নিজের অন্যায কবার মধ্যেই বা পার্থক্য কী ? মনে মনে মহেশ চৌধুরি স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে আর ভাবিবার কিছু নাই, বিভূতিকে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা উচিত কী অনুচিত এটা আর প্রশ্নই নয়, এখন আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভূতি তার ছেলে। বিভূতি যে তার স্ত্রীরও ছেলে এটা এতক্ষণ মহেশের যেন খেয়াল ছিল না। বিভূতির মার চাদর মুড়ি দেওয়া মূর্তি এই আসল সমস্যাকে তাই একটু বেশি রকম জটিল করিয়া দিয়াছে।

বিভূতির মার ছেলেকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অপিকার কি তার আছে ?

ভালো ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে—গ্রামে আর এমন ছেলে নাই। কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত—ভালোমন্দের ধারণাটা ভুল। অনেকগুলি মানুষকে খাপাইয়া তুলিবার আনন্দ, দু-দিন পরে যখন প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ ঘটিয়া যাইবে, কতকগুলি মানুষ যাইবে জেলে অর্থাৎ কতকগুলি যাইবে হাসপাতালে আর কতকগুলির দেহ উঠিবে চিতায়, আনন্দের তখন আর তার সীমা থাকিবে না। জেল, হাসপাতাল বা চিতা এর কোনোটার জন্য নিজেরও অবশ্য তাব ভয় নাই। ছেলের এই নির্ভীকতাও মহেশের আর একটা বিপদ। নিজের কথা যে ভাবে না, স্বাধীনভাবে চলাফেরার বয়স যার হইয়াছে, ছেলে বলিয়া আর মতের সঙ্গে মত মেলে না বলিয়া তার উপর বাপের অধিকার খাটানোর কথা ভাবিতে মনটা মহেশের খুঁতখুঁত করে।

মহেশ চৌধুরি নির্বাক হইয়া থাকে প্রায় তিন দিন। গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ নয়, উদাস নয়, শুধু নির্বাক। বিভূতির মাও নির্বাক হইয়া থাকে, কিন্তু তাকে বড়ো বেশি গম্ভীর, বিষণ্ণ আর উদাস মনে হয়।

বিভূতি বলে, কী হয়েছে মা ?

বিভূতির মা বলে, কিছু হয়নি।

বিভূতি পিছন হইতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া চূপচূপি বলে, শোনো, আমার জন্যে ভেবো না। ভয় নেই, আমি আর জেলে যাব না। সে সব ছেলেমানুষি বোকামির দিন কেটে গেছে।

তবু বিভূতির মার প্রথমটা মনমরা ভাব কাটিতে চায় না। বরং বাড়িবার উপক্রম হয়। কারণ একদিন মহেশ চৌধুরি সোজাসুজি বিভূতির সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তের কথাটা তাকে শুনাইয়া দেয়।

বিভূতির মা প্রথমটা শোনে হাঁ করিয়া, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বসে, বেশ তো, তাড়িয়ে দাও।

তুমি কী করবে ?

আমি ? গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে গিয়ে ডুব দেব।

সত্যি ? না, তামাশা করছ ?

ছোটো ছেলেকে প্রথম ভাগ পড়ানোর মতো ধৈর্যের সঙ্গে বিভূতির মা বলে, দ্যাখো পষ্ট কথা বলি তোমাকে শোনো। তুমি না থাকলেও আমার এক রকম করে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব না বলে রাখছি।

মহেশ তা জানিত, এতদিন খেয়াল করে নাই।

এই কথা ভাবছ বুঝি কদিন ? বিভূতির মা জিজ্ঞাসা করে।

মহেশ চৌধুরি নীরবে মাথা হেলাইয়া সায় দেয়।

বিভূতির মা তার মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, কেন শূনি ? কী জন্যে শূনি ? ওর কথা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কী শূনি ? ছেলে বড়ো হয়েছে, বিয়ে-থা দিয়েছ, তার যা খুশি

সে করুক। তোমার তাতে কী? তোমার কাজ তুমি করে নাও, তার কাজ সে করুক—তুমি কেন ওর পেছনে লাগতে যাবে?

মহেশ ভাবিতে ভাবিতে বলে, নিজের কাজ করার জন্যেই তো ওর পেছনে লাগতে হচ্ছে গো।

ভাবিতে ভাবিতে মহেশ চৌধুরির দিন কাটে। মানুষটাব অনেক পবিবর্তন হইয়াছে—সদানন্দের অধঃপতনের আঘাতে অথবা সদানন্দের সম্বন্ধে ভুল কবাব ধাক্কা। আর যেন নিজের উপর সে সহজ বিশ্বাস নাই। সমস্ত প্রশ্নই আজকাল ধাঁধার মতো মনে হয়। কত সন্দেহই যে মনে জাগে! জীবনের পথে চলিবার জন্য আত্মবিশ্বাসের একটি মাত্র রাজপথ ধবিয়া এতকাল চলিবার পর বুদ্ধিবিবেচনা যেন ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন পথের অস্তিত্ব দেখাইয়া তাব সঙ্গে খেলা আরম্ভ কবিয়া দিয়াছে। বিভূতির মার সঙ্গে আলোচনা কবার পর একটা যে প্রচণ্ড সংশয় মহেশের মনে জাগে, তাব তুলনা নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কী কবা উচিত হিব করিযা ফেলাব পর সেটা করা সত্যই উচিত কি না সে বিষয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তার মনে আসিয়াছে, প্রথমে যা খেয়ালও হয় নাই। বিভূতির সম্বন্ধে কী করা উচিত জানিয়াও তা না কবা এককথা—নিজেব অনেক দুর্বলতাব মন্থে একটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে গণ্য কবা যায় আর দুঃখিত হওয়া চলে। কিন্তু এ তো তা নয়! অনেক বিষয় বিবেচনা না কবিয়াই সে যে কী কবা উচিত হিব কবিয়া ফেলিয়াছে। তার সমস্ত বিচার-বিবেচনাই কি অসম্পূর্ণ, একপেশে? কেবল উপস্থিত প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর কবিয়া আদালতের চোখ-কান বুজিয়া বিচার কবার মতো নিজেব জ্ঞান আব বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি লক্ষ্য নিরপেক্ষতা? একটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কত কথা ভাবিবার থাকে, নিজেব ভাবিবার ক্ষমতা দিয়া কী সে প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত, যদি মীমাংসা করার আগেই সমস্ত কথাগুলি ভাবিবার ক্ষমতা না থাকে? চিবজীবন সে কি এমনই ভুল করিয়া আসিয়াছে? মানুষ কি এমনই ভুল করে, পৃথিবীর সব মানুষ?

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানে আব নূতন জ্ঞানের আলোকে এই ভুলকে আবিষ্কার করে?

এবং হয়তো আবার নূতন জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করে যে এই আবিষ্কারটাও মিথ্যা?

সুতরাং বিষম এক জটিল সমস্যা নিযা মহেশ চৌধুরি বড়োই বিব্রত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু হাস্যকর মোটেই নয়। জগতে এমন কে চিন্তাশীল আছে এ সমস্যা যাকে পীড়ন না করে? এ সংশয়ের হিমালয় না ডিঙাইলে তো চরম সত্যের সন্ধানে পাওয়া যায় না।

[লেখকের মন্তব্য: মহেশ চৌধুরির আসল সমস্যাঃ কথাটা আমি একটু সহজভাবে পবিষ্কার করিয়া বলিয়া দিই। বলার প্রয়োজনও আছে। মহেশ চৌধুরির মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইলে তার মনের অবস্থাটা বুঝা সম্ভব, ধাঁধাটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো প্রশ্নের বিচারের সময় সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা উচিত। এই কথাটা মহেশ চৌধুরির মনে হইয়াছে। কথাটা গুরুতরও বাটে, যুক্তিসঙ্গতও বাটে। কিন্তু মুশকিল এই, কেবল প্রশ্ন নয়, জগতে এমন কী আছে যাব সঙ্গে জগতের অন্য সমস্ত কিছু সংশ্লিষ্ট নয়? অস্তিত্বের অর্থই তাই—সমগ্রতা। বিচ্ছিন্ন কোনো কিছুব অস্তিত্ব নাই। এদিকে মানুষের মস্তিষ্ক এমন যে সেখানে এক সময় একটির বেশি সমগ্রতার স্থান হয় না—অংশও মস্তিষ্কের পক্ষে সমগ্র। জগতের অসংখ্য আংশিক সমগ্রতাকে ধারাবাহিকভাবে বিচার করিয়া কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত দর্শন তাই একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে—আংশিক সমগ্রতার পরিধি বাড়াইয়া চলা। দুটি অংশের একত্ব আবিষ্কার করিয়া দুটি আংশিক সমগ্রতাকে এক করিতে পারিলে জ্ঞানের পথে, চরম বা পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, এক পা অগ্রসর হওয়া গেল। আজ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের সমগ্রতাকে নিজের ব্যক্তিগত একটি মাত্র সমগ্রতায় পরিণত করিতে পারিয়াছে কি না, ভবিষ্যতে কোনোদিন পারিবে কিনা জানি না।

তবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানুষকে এমনিভাবে সংগ্রহ করিতে হয়, সংকীর্ণ জীবনের তুচ্ছ সমস্যার বিচারও করিতে হয় এমনিভাবে। তাছাড়া আর উপায় নাই। জন্ম হইতে সকলে আমরা করিয়াও আসিতেছি তাই। শৈশবেও সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি, আজও করিতেছি। তখন যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে ছিল কাজে লাগাইতাম, আজ যেটুকু জ্ঞান আয়ত্তে আছে কাজে লাগাই। তখনকার জ্ঞান হয়তো ছিল মোটে কয়েকটি টুকরা জ্ঞানের যোগফল, আজকের জ্ঞান হয়তো অনেক বেশি টুকরার মিলিত পরিণাম, কিন্তু তখনও যেমন আর টুকরাগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা ঘামাইতাম না, আজও ঘামাই না। জলের সঙ্গে জল মেশার মতো, আলোর সঙ্গে আলো মেশার মতো, মিলিত আংশিক জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সমস্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন জাগিলে, সাময়িক যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির সম্পত্তি দিয়া তার বিচার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও পায়। জবাব না মানা আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করা আজ: নিজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত যুক্তি বা সত্যোপলব্ধির কাছে আপিলেব ভবসা করা অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ আপিলের ফলটাও হয়তো মন মানিতে চায় না—শেষ যুক্তি বা শেষ সত্যের আদালত খুঁজিয়া মরিতে হয়।

সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াকে মানুষকে। প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করিতে আজ তাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করিতে হয়। কে জানে এমন একদিন আসিবে কিনা যেদিন কেহ আমার এই উপন্যাসটি পড়িতে বসিয়া প্রথম লাইনটি পড়িয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে, লাইনটির যে অর্থ মনে আসিয়াছে তাই কী ঠিক, অথবা প্রত্যেকটি শব্দের আর প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ভালো করিয়া ঘাঁটিয়া, শব্দতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব সন্দেহে জ্ঞান অর্জন করিয়া লাইনটির মানে যাচাই করা উচিত ?]

একটি দুপুর তো বিভূতির মাধবীলতার সঙ্গে অপবিসীম আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু বাত্রি ? পরের দিনের দুপুরটা ? তার পরের দিনরাত্রিগুলি ? দুপুরটা যেন ছিল মাতালের মাঝরাত্রির মতো, শেষ হওয়ার সঙ্গে জীবনের আর কিছুই যেন রহিল না। তারপর কয়েকদিন ধরিয়ামাতলামির ক্ষুধায় ভিতরটা যেন জুলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ন্যায়বিক বিকারের ভাটিখানায় বড়ো বেশি খামখেয়ালি চলে।

তাই আর কোনো কারণ, কোনো তুচ্ছতম নূতন ঘটনা, না ঘটিলেও মাধবীলতার উপর অবিশ্বাসে বিভূতির যেন প্রায় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অনেক যুক্তিই মনে আসিতে লাগিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান, সে নিজে অতি অপদার্থ, আকর্ষণহীন, কুৎসিত পুরুষ। কেবল তাকে নিয়া খুশি থাকা মাধবীলতার পক্ষে কি সম্ভব ?

হঠাৎ আবার একদিন বিভূতি জেরা আরম্ভ করে, কই সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন, তা তো বললে না ?

মাধবীলতা ভয় পাইয়া বলে, বললাম যে ?

কই বললে ?

ওই যে সেদিন বললাম।

হুঁ বলিয়া বিভূতি চূপ করিয়া যায়।

গভীর বিভ্রমণয় পিছন ফিরিয়া সে শূইয়া থাকে, মাধবীলতা মৃদুস্বরে ডাকিলে বলে, বড়ো ঘুম পাইয়াছে। ঘুম কিন্তু আসে না, মনের অস্বস্তি দেহের একটা অপরিচিত যন্ত্রণার মতো তাকে জাগাইয়া রাখে। মনে হয়, ঠিক চামড়ার নীচে সর্বাত্মে পেটের অস্থলের জ্বালা যেন ছড়াইয়া গিয়াছে আর বাহিরের গুমোটে তাতিয়া উঠিয়াছে মাথাটা। অথচ এমন আশ্চর্য ব্যাপার, শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পরদিন

যখন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে, মনের অবস্থাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। পাশে যে অসতী স্ত্রী ছিল গতরাত্র, অবিশ্বাসের সব কিছু ঝাড়িয়া ফেলিয়া আজ সকালে সে যেন চোপের আড়ালে সংসারের কার্য করিতে গিয়াছে। আগের রাত্রের ধাবণা আজ বিভূতির নিছক ছেলেমানুষি মনে হয়। এমনই তুচ্ছ মনে হয় কথাটা যে ও বিষয়ে একটু চিন্তা কবাটাও তার কাছে পরিশ্রমের অপচয়ের শামিল হইয়া দাঁড়ায়। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন বিচলিত হইয়াছিল, দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। অনুভূতির জগতে যদিবা একটা দুর্বোধ আতঙ্কের জের এখনও আছে, পেটে অম্বলের শত্রুতা নাই, দোহে টনটনানি নাই, মাথায় গ্রীষ্মবোধও নাই। একটু শুধু ভারী মনে হইতেছে দেহটা। বোধ হয় হৃদয়ের ঈষৎ চাপাপড়া বেদনাবোধের ভারে।

চা আর খাবার খাইয়া বিভূতি গ্রামের দিকে যায়। শেষরাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের জন্য রোদেরও তেমন তেজ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে বিভূতি গিয়া হাজির হয় শ্রীধরের দোকানে। দোকানের সামনে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া কয়েকজন ফিসফাস করিতেছিল, বিভূতিকে দেখিয়া তারা অপরাধীর মতো চূপ করিয়া যায়।

শ্রীধর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলে, আসেন। বসেন। বিড়ি খান? বিভূতি বসে কতকটা উদাসভাবেই মাথা নাড়িয়া বলে, বিড়ি তো আমি খাই না।

শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলে, ঠিক বটে, শহরে ছিলেন এতকাল, আপনারা খান সিগারেট। তা তো নেই দাদাবাবু! তারপর কোথা হইতে কী করিয়া শ্রীধর যে মারাত্মক গার্ভীয় মুখে টানিয়া আনে সেই জানে, একটা অদ্ভুত আপশোশের শব্দ করিয়া বলে, শহর ভালো। জানেন দাদাবাবু, মোদেব এ সব লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ের চেয়ে শহর ঢের ঢের ভালো। বউ-ঝি নিয়ে নিভ্ভাবনায় ঘর তো কবা চলে—ঘরের বউ-ঝিকে তো কেউ জোর করে ধবে নিয়ে যায় না।

যারা ফিসফাস করিতেছিল তারা সকলে একবাক্যে সায় দেয়। একজন, রামলোচন দে, কাঁচাপাকা চুলের বাবরিতে ঝাঁকি দিয়া বলে, আপনি তো বলে খালাস দাদাবাবু, মবি যে আমরা। হুঁ, নিজের দোষে মরি তো বটে, উপায় কী বলেন ?

ক্রমে ক্রমে নানারকম আপশোশমূলক মস্তব্য ও প্রশ্নের বাধা ডিঙাইয়া আসল ব্যাপারটা বিভূতির বোধগম্য হয়। কারণও বউ-ঝি কেউ সম্প্রতি হরণ করে নাই, যদিও কিছুকাল আগে এ রকম একটা ব্যাপার এই গ্রামেই ঘটিয়া গিয়াছে। সকলের বর্তমান রাগ-দুঃখ আব আপশোশের কারণটা এই। নন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া পাকা নাটমন্দিরের অভাব মিটানোর জন্য খড়ের একটা চালা তুলিয়াছে। তার নীচে নানা উপলক্ষে, মাঝে মাঝে বিনা উপলক্ষেও যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতি হয়। খড়ের নাটমন্দিরটিতে স্থান একটু কম, তবে সাধারণ অনুষ্ঠানের সময় সেই স্থানও সবটা ভরে না। মুশকিল হয় ভালো দলের যাত্রা বা নাম করা কীর্তনীয়ার কীর্তন বা ওই রকম কোনো প্রোগ্রাম থাকিলে, যার আকর্ষণ আছে। তখন চালার নীচে অর্ধেক লোকের বসিবার স্থান হয় না, ভিড়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। তাতেও কোনো আপত্তি ছিল না, যদি ও গ্রামের ভদ্রলোকেরা এ গ্রামের ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে সামনে গিয়া বসিতে দিত।

জায়গা থাকলেও বসতে দেয় না দাদাবাবু। এগিয়ে গিয়ে বসতে গেলে ঠেলে পিছনে হটিয়ে দেয়। কেন আমরা শতরঞ্ধিতে বসতে পারি না সামনের দিকে? চাঁদা দিই না আমরা? ও কি তোদের বাপের সম্পত্তি যে শুধু গাঁয়ের বাবুদের জন্যে বেদখল করে রাখিস?

আগের দিন শ্রীধর, রামলোচন এবং আরও অনেকে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে দেখিয়া যেই বসিতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা। কে একজন

শ্রীধরের পিঠে সত্যই একটা ধাক্কা দিয়াছিল এবং আর একজন রামলোচনের বাবার ধরিয়া দিয়াছিল টান।

শেষে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনিল।

বিভূতি আশ্চর্য হইয়া বলে, তারপরেও যাত্রা শুনলে ?

শুনব না ? চাঁদা দিইনি আমরা ?

বিভূতি খানিকক্ষণ চূপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিয়া যায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, ওরা কী বলল, যারা তোমাদের ঠেলে সরিয়ে দিলে ?

জবাব দিল শ্রীধর। কী আব বলবে দাদাবাবু, বলল, পিছন দিকে তোমাদের জন্যে বসবার জায়গা থাকে, আগে এসে বসতে পার না ?

একটা দিন হয়তো বিশেষ কারণে—

একটা দিন 'প্রত্যেকবার এমনই হচ্ছে, একটা দিন কী দাদাবাবু ! মোদের গাঁয়ের কেউ সামনে গিয়ে বসতে চায় না।

এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিভূতির সাধ যায় না। মনে হয়, প্রতিবাদ করার মতো ব্যাপারও এটা নয়। যাত্রা শুনিতে গিয়া প্রামের কয়েকজন বসিবার স্থান পায় নাই বলিয়া কি বিচলিত হওয়া চলে ? তবু বসিবার স্থানের উপর এ খামের লোকেরও অধিকার আছে, স্থান থাকিলেও যদি তাদের বসিতে দেওয়া না হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্তব্য। নিজের চোখে দেখিয়া ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে বিভূতি বলে, সামনের জন্মাষ্টমীতে যাত্রাটাত্রা হবে না ?

শ্রীধর বলে, তিন রাত্তির হবে, অনেক মজা আছে দাদাবাবু।

বিভূতি বলে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যেও, দেখি কেমন বসতে না দেয়।

একজন একটু সংশয় ভরে জিজ্ঞাসা করে, কী করবেন ?

বিভূতি হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলে, আমি একা কী করব ? তোমরা সবাই করবে—জায়গা থাকলে সেখানে বসে পড়বে। আবার কী ?

আঠারো

নেতা হওয়া যে এত সহজ আর নেতৃত্ব করা এমন কঠিন, বিভূতি তা জানিত না। এবাব সে ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে। শ্রীধরের দোকানে বসিয়া মাত্র কয়েকজনের কাছে সে আবেগের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিল যে নন্দনপুরের যাত্রার আসবে সামনে বসিবার অধিকার সে তাদের আদায় করিয়া দিবে, জন্মাষ্টমীর দিন দেখা গেল নানা বয়সের প্রায় দেড়শো মানুষ তার এই অধিকার আদায়ের অভিযানে যোগ দিয়াছে। শ্রীধর বা বামলোচনের মতো যারা অন্তত ফতুয়া গায়ে দিয়া যাত্রা শুনিতে যায়, এদের অধিকাংশই সমাজের সে স্তরের মানুষও নয়। এরা যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে, আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মাঝে বসিতে পাইলে বোধ হয় রীতিমতো অস্বস্তিই বোধ করে। শ্রীধর, বামলোচন প্রভৃতির মতো চাঁদা দিয়াও সামনে বসিতে না পাওয়ার অপমানে এরা ক্ষুব্ধ হয় নাই। চাঁদাই বা এদের মধ্যে ক-জন দিয়াছে কে জানে ! কোথা হইতে দিবে ? খাজনা দিতে যাদের অনেকের ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়, চাঁদা দেওয়ার বিলাসিতা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না।

তবু তার নেতৃত্বে যাত্রার আসর আক্রমণের জন্য সকলে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনপুরের স্থায়ী আটচালার নীচে সর্বসাধারণের যাত্রার আসর। চাঁদা দিক বা না দিক, গায়ে ফতুয়া থাক বা না থাক, এদের সকলেরই অবশ্য সে আসরে সামনে বসিবার অধিকার আছে। কিন্তু এরা

কি তাই চায় ? সেই জনাই কি এরা সকলে জড়ো হইয়াছে ? বাঁচিবার অধিকার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এদের সে যে সব কথা বলিয়াছে, এ কি তাবই প্রতিক্রিয়া ?

এই প্রশ্ন বিভূতিকে পীড়ন করিতে থাকে। তার বহুতা আর উপদেশ এতগুলি মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে এ কথা বিশ্বাস কবিত্তে ভালো লাগে কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রতিযোগিতা থাকে, মনোমালিন্য থাকে—এক গ্রাম অন্য গ্রামকে অন্যায়সে হিংসা করে। কে জানে এরা নন্দনপুর্বের অধিবাসীদের একটি জন্ম করিতে চলিয়াছে কি না ? শ্রীধর, রামলোচন আর অন্যান্য কয়েকজন ফতুয়াধারী হয়তো নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধি জনা এই সব অর্শিক্ষিত সরল মানুষগুলিকে খাপাইয়া দিয়াছে। যাত্রার আসরে হয়তো আজ একটা বিস্ত্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আর পিছাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। বিভূতি বাববাব সকলকে আসল কথাটা বুঝাইয়া দেয়। গালাগালি হাতাহাতি চলিবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে সকলে সামনের দিকে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পড়িবে, কিছুতেই আর সেখান হইতে উঠিবে না।

একজন প্রশ্ন করে, ওরা যদি গাল দেয়, অপমান করে ? যদি মারে ? বিভূতি জবাব দেয়, তবু চুপ করে বসে থাকবে, কথাটি কইবে না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওবাই লজ্জা পাবে। ওবা যদি ছোটোলোকামি করে আমবা কেন ছোটোলোক হতে যাব ?

বিভূতি ইচ্ছা করিয়াই সকলকে সঙ্গে নিয়া যাত্রা আবস্ত হওয়ার অনেক আগে আসরে গিয়া হাজির হইল। মানুষ তখন জমা হইয়াছে অনেক তবে বসিবার স্থানও যথেষ্ট ছিল। সামনের বিশেষ স্থানগুলি রাখা হইয়াছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য। সকলে দল বাঁধিয়া সেই স্থানগুলি দখল করিয়া বসিবার উপক্রম কবিবামাত্র কয়েকজন ভলান্টিয়ার আসিয়া প্রতিবাদ কবিল। বিভূতি যেখানে খুশি বসুক, বিভূতির দু-একজন বন্ধুবান্ধবও বসুক, কিন্তু সকলে বসিলে চলিবে কেন !

বিভূতি খুব অহিংসভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, কেন চলবে না ? এবা সকলেই আমার বন্ধু !

একজন ভলান্টিয়ার, বয়স তাব আঠাবো উনিশের বেশি হইবে না, একগাল হাসিয়া বলিল, আর আমবা বুঝি আপনাব শত্রু ?

না, তা বলছি না—

একজন তিন-চাবহাত তফাত হইতে বিভূতির মুখগহ্বরটিকে পিকদানি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ ভাসাইয়া পানের পিক বুকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভূতি মুছিবাব চেষ্টাও করিল না। এক লাফে সামনে আগাইয়া গিয়া এক হাতে অপরাধীর গলাটা টিপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে তাকে মাঝিতে লাগিল কিল চড় ঘুষি। আব একজন চট করিয়া বসিয়া পড়িয়া পিছন হইতে বিভূতিব পা ধরিয়া মারিল এক হাঁচকা টান, বিভূতি মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

একজন চিংকার কবিয়া উঠিল : মার শালাদের।

অনেকের মুখে প্রতিধ্বনি শোনা গেল : মার ! মার ! মার !

অধিকাংশ লোক যেন দাঙ্গার জনাই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে এমন দাঙ্গা বাধিয়া গেল বলিবার নয়। কোথা হইতে যে এত লাঠি ইট পাটকেল আসিয়া জুটিল ! কয়েকটা মাথা ফাটিয়া গেল, অন্যভাবে আহত হইল অনেকে। হইহই রইরই হুলা, ছুটাছুটি, মারামারি—এক গ্রামেব লোক যেভাবে পারিতেছে অন্য গ্রামের লোককে আঘাত করিতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ভালো করিয়া দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত কারও নাই। একজন হয়তো পেছন হইতে অন্য একজনের মাথায় লাঠি মারিবার আয়োজন করিয়াছে এমন সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি লোহার একটা মুখ-সবু শিক তার পিঠের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। এ ধরনের অস্ত্রও কেউ কেউ দু-একটা সঙ্গে

আনিয়াছিল। কেবল আজ নয়, আগের দুদিনও আনিয়াছিল। মারামাঝিটা যে আজ হঠাৎ লাগে নাই, এ তার একটা মস্ত বড়ো প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত বিভূতির স্থাপিত ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা আসিয়া সেদিনকার মতো সেখানকার হাঙ্গামাটা থামাইয়া দিল। মারামাঝিটা হইতেছিল এক গ্রামের লোকের সঙ্গে আর এক গ্রামের লোকের এবং বিভূতি ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করিয়াছিল এক এক গ্রামে একটা করিয়া। কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, মারামাঝিটা বন্ধ করিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্যায়াম সমিতিগুলির সদস্যেরা একসঙ্গে মিলিয়া। অধিকাংশই মাথা-গরম যুবক কিন্তু তাদের মধ্যে এমন ঘোরতর মিল দেখা গেল ঠান্ডামাথা বৃড়োদের মধ্যে যা সম্ভব হয় না।

আহত বিভূতিকে তারা গোরুর গাড়িতে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। বিভূতির আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়, অন্তত দেহের আঘাত নয়। অন্যান্য যারা আহত হইয়াছিল তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু অধিকাংশ আহত মানুষ যে কোথায় উধাও হইয়া গেল তার আর কোনো পাতাই মিলিল না।

মারামাঝি কিন্তু সেইখানে শেষ হইল না।

এক গ্রামের কয়েকজন অন্য গ্রামের একজনকে একা পাইলে ধবিয়া পিটাইয়া দিতে লাগিল। মারামাঝির পরদিন সকালে নন্দনপুরে গিয়া মহেশ চৌধুরি মার খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। মাথাটা তার ফাটিয়া গেল এবং দাঁত ভাঙিয়া গেল কয়েকটা।

বিভূতি আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরিলে মহেশ চৌধুরি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ ?

বিভূতি বলিয়াছিল, না। যাতে দাঙ্গা না বাধে তার চেষ্টা করেছিলাম। কথাটা মহেশ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু তখনকার মতো কিছু আর বলেও নাই। পরদিন সকাল হইতে না হইতে আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিজে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোঁজখবব নেওয়ার সুযোগটাও সে পায় নাই। তাকে দেখিয়াই নন্দনপুরের জনপাঁচেক বদমেজাজি মানুষ বলিয়াছিল ; বিভূতির বাপ-ব্যাটা এসেছে বে !

বলিয়াই তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অনেক বেলায় খবর পাইয়া বিভূতি তাকে আনিতে গেল। বাপের অবস্থা দেখিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। যাদের সে যাচিয়া আগের দিন যাত্রার আসরে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিল, মারামাঝির জন্য তাদের উপরেও তার বিরক্তির এতক্ষণ সীমা ছিল না। এ রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘটানোর জন্য মনে মনে তার বড়োই খারাপ লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রকম বর্বর যদি তার দেশের মানুষ হয় আর এই রকম কারণে অকারণে পরস্পরকে হিংসা করে আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ বাধায়, দেশের তবে হইবে কী ? আজ আহত বাপকে দেখিয়া সর্বাগ্রে তার মনে হইল, যারা তার বাপকে এ ভাবে মারিয়াছে, তাদের কিছু উত্তম মধ্যম না দিলে জীবনধারণ করাই বৃথা।

কিন্তু কে যে মহেশ চৌধুরিকে মারিয়াছে, কেউ তা জানে না। অত সকালে আটচালার দিকে বড়ো কেউ যায় নাই। একটু বেলায় মহেশকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে একটা গোলমাল বাধিয়া যায়। তখন নন্দনপুর ব্যায়াম সমিতির সদস্যেরা তাকে সহজে তুলিয়া আনিয়া সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাক্তার দেখাইয়া পালকিতে করিয়া মহেশকে বাড়ি নিয়া যাওয়া হইল। সারাদিন সারারাত বিভূতি মহেশের শিয়রে বসিয়া রহিল, বিভূতির মা বসিয়া রহিল পায়ের কাছে। মাধবীলতাও ওই রকমভাবেই রাতটা কাটাইবার আয়োজন করিয়াছিল, বিভূতির জন্য পারিয়া উঠিল না। মাঝরায়ে বিভূতি তাকে এমন একটা অপমানজনক ধমক দিয়া ন্যাকামি করিতে বারণ করিয়া দিল যে কাঁদিয়া ফেলিয়া মাধবীলতা উঠিয়া গেল।

মহেশ চৌধুরির জ্ঞান ফিরিল পরদিন সকালে।

উদ্ভ্রান্ত ভাবটা একটু কাটিয়া আসিলে বিভূতি মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় কে মেরেছে বাবা ?

মহেশ চৌধুরি বলিল, একজনে কী মেরেছে—চার-পাঁচজনে।

কেন মারল ?

তোমার জন্যে। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তাব প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

উদ্বেজিত হওয়ার ফলে হঠাৎ ব্যথায় মহেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

তুমি আমার বাবা বলে তোমায় মারল ? কে কে মারল ?

মহেশ চৌধুরি চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিল, ওরা সবাই ভালো লোক, অকারণে কখনও মারত না। যোগেন, দীনু, কালীপদ, রমানাথ আর নগেনের সেজোমামা ছিল,—কী যেন নাম লোকটার ? আমি তো ওদের কোনোদিন ক্ষতি করিনি, মিছিমিছি কেন ওবা আমায় দেখামাত্র পিটাতে আরম্ভ করবে ?

নড়িতে গিয়া মৃদু একটা আর্তনাদ করিয়া মহেশ চৌধুরি চুপ করিয়া গেল।

বিভূতি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমি যদি ওদের তোমাব মতো অবস্থা না কবি, তোমাব ব্যাটা নই আমি।

কাতরহইতে কাতরহইতে চোখ মেলিয়া মহেশ চৌধুরি বলিল, তুমি যদি আবার ওদের পিছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মতো ত্যাগ করব বলে রাখছি।

তা তুমি ত্যাগ কোরো। তাই বলে ঘাড় গুঁজে এ অন্যায় সহ্য করা—

কীসের অন্যায় ? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর কী ? মেবেছে আমাকে তোমাকে তো মারেনি, তোমার মাথা ঘামাবার দরকাম ?

বাঃ, বেশ ! বলিয়া বিভূতি খানিকটা হতভয়ের মতোই বসিয়া রহিল। মহেশ চৌধুরি বলিতে লাগিল, তুমি ওদেব পেছনে লাগবে, বদনাম রটবে আমার। সবাই বলবে আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।

বিভূতি বলিল, তুমি এমন কাপুবুস !

কাপুবুস ?

নয় তো কী ? লোকে নিন্দে করবে ভয়ে মুখ বুজে এত বড়ো অন্যায় সহ্য করে যাবে ! লোকের নিন্দা-প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে !

বিভূতির মা ব্যাকুলভাবে বলিল, চুপ কর না বিভূতি ? কী যে তোরা আবস্ত করেছিস !

বিভূতি কথটা গ্রাহ্য কবিল না, চুপচাপ একটু ভাবিয়া বলিল, নিন্দা-প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে পিটিয়ে দিল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে। ভীৰু কাপুবুস বলবে।

মহেশ সভয়ে বলিল, কী করবি তুই ?

বিভূতি বলিল, ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে কেবল ওনা একাই জানে না।

তাতে লাভ কী হবে ?

ভবিষ্যতে আর এ রকম করবে না।

আরও বেশি করে করবে। তার চেয়ে সেরে উঠে আমি যদি গিয়ে হাসিমুখে এদের সঙ্গে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কীরকম লজ্জা পাবে বল তো ?

ছাই পাবে। ভাববে, আবার মার খাবার ভয়ে খাতির করছ।

মহেশ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তার তর্ক করার ক্ষমতা ছিল না। তখনকার মতো সে চূপ করিয়া গেল। কিন্তু বিভূতি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আবার তাকে ডাকিয়া বসাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। রাগ করিয়া, মিষ্টি কথা বলিয়া, মিনতি করিয়া, কতভাবেই যে সে বিভূতিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিল। যতই সে কথা বলিতে লাগিল বিভূতির কাছে ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তার ভয়ের পরিচয়—মার খাইয়া মহেশ চৌধুরি মার ফিরাইয়া দিয়াছে মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়! মহেশ চৌধুরিকে এমন দুর্বল বিভূতি আর কখনও দেখে নাই। শেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে। বলিয়া ঘব ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল। হাতহাতি মারামারি সে নিজেও কোনোদিন পছন্দ করে না, ও সমস্ত সত্যই নীচতা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি তাই? মহেশ চৌধুরি কেনো অপরাধ করে নাই, কেবল তাব বাবা বলিয়া তাকে যারা মারিয়াছে, উদারভাবে তাদের ক্ষমা করাটা কি উচিত? তাকে কি উদারতা বলে? তার চেয়ে ছোটোলোকের মতো ওদের ধরিয়া কিছু উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেওয়াই কি মহত্ত্বের পরিচয় নয়, মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয়? ভাবিতে ভাবিতে বিভূতি বুঝিতে পারিল, মাধবীলতা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গতবাত্রে মাধবীলতাকে বিশ্রী ধমক দিয়া কাঁদানোর কথাটা মনে পড়ায়, ভাব করাব উদ্দেশ্যে হঠাৎ সে মাধবীলতাব কাছে পরামর্শ চাহিয়া বসিল।

মাধবীলতা চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলিল, ওদেব মেরে ফেলা উচিত, খুন করে ফেলা উচিত।

বিভূতি হাসিয়া বলিল, সত্যি? কিন্তু ওরা যদি আমায় মেবে ফেলে?

বিভূতি হাত বাড়াইয়া দিতে মাধবীলতা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যেন অধীর আগ্রহে সে এই জনাই অপেক্ষা করিতেছিল। বিকালের সঙ্গে ভালোবাসার তীব্রতা বাড়িয়া গিয়াছে। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়া-মমতা জোরালো হয় না। একরাত্রিবি অভিমান সংক্ষুব্ধ বিবচ মাধবীলতাকে অধীর করিয়া দিয়াছে।

হাজ্ঞামার ফলে নন্দনপুবে যাত্রা আব কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সেই যাত্রা আব কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা কবা হইল আশ্রমে। বুদ্ধিটা মাথায় আসিল কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের। তাবা ভাবিয়া দেখিল, আশ্রমে সব গ্রামের লোকের সমান অধিকার, সেখানে বিশেষ সুবিধাও কেউ দাবি কবিতে পারিবে না, বদমাইশি কবিয়া গোলমাল সৃষ্টি করাব সাহসও কারও হইবে না। যেদিন সকালে মহেশ চৌধুরিব জ্ঞান ফিরিয়া আসিল সেইদিন দুপুরে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্তন। রাত্রি আটটা-নটার সময় যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইবে এবং সমস্ত রাত চলিবে।

বিভূতি যখন দল বাঁধিয়া বাপেব প্রহারকাবীদের খোঁজে বাহিব হইল, তখন পুরা দমে কীর্তন চলিত্রেছে। বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটি অপরাধীর খোঁজ করিতে গিয়া বিভূতি শুনিল, তারা সকলে কীর্তন শুনিতে গিয়াছে। বিভূতি তখন সোজা আশ্রমে চলিয়া গেল।

আসর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কীর্তনের দলটি নামকরা, প্রধান কীর্তনিয়ার গলাটি মধুর আর আবেগ-রোমাঞ্চকর—শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্মিবেন, যুগে যুগে তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিরা যার হৃদিস পায় না তিনি কেন নিজে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিবেন এই কথাটা সুর করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বলিতেই সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে, গদগদ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকজনের চোখে জলও দেখা দিয়াছে।

সদানন্দের কিছু তফাতে অপরাধী পাঁচজন বসিয়াছিল। মনে তাদের একটু ভয় ঢুকিয়াছে, মহেশ চৌধুরি যদি মরিয়া যায়! কাছাকাছিই বসিয়া চূপিচূপি ইঞ্জিতে তারা এ বিষয়ে প্রথমে একটু

আলাপ করিয়াছিল, তারপর চুপ করিয়া কীর্তন শুনিতোছে। দলবলসহ আসিয়া বিভূতি যখন আসরের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাদেব খোঁজেই চাবিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, তার উপর পাঁচজনেরই নজর পড়িল।

পাঁচজনকে দেখিয়া বিভূতি সঙ্গীদের বলিল, ওই যে ওরা।

সঙ্গীদের একজন একটু দ্বিধাভরে বলিল, এত লোকের মাঝখান থেকে টেনে আনা কি উচিত হবে ?

বিভূতি বলিল, প্রথমে ডাকব, যদি আসে ভালোই। না এলে ঘাড় ধরে টেনে আনতেই হবে। শান্তিটা সকলের সামনেই দিতে হবে।

ইতিমধ্যে সদানন্দ বিভূতিকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে—মহেশের খবর জানিবে। বিভূতিকে আশ্রমে দেখিয়া সদানন্দ সতাই খুশি হইয়াছিল। বিভূতি মুখ তুলিয়া তার দিকে চাইতে সে একটু হাসিল। বিভূতি হাসিল না, হাসিবার মতো মনের অবস্থা তার তখন নয়, শুধু মাথা একটু কাত করিয়া হাসির জবাব দিল।

লোকটিকে বলিল, বলো গে, একটু কাজ সেরে আসছি।

পূর্ণেন্দু নামে একটি যুবককে বিভূতি অপরাধী পাঁচজনের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ণেন্দু গিয়া বলিল, মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একটু বাইরে ডাকছেন—বিশেষ দরকার।

যোগেন ভড়কাইয়া গিয়া বলিল, আমাদের ডাকছে ? কেন ডাকছে।

দরকার আছে, আসুন।

আমাদের ডাকছে ? আমাদের কাদের ?

পূর্ণেন্দু একে একে আঙুল দিয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া দিল, আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে—আপনাকে।

পাঁচজনেই ভড়কাইয়া গেল। আসব ছাড়িয়া কি যাওয়া যায় ? দরকার থাকিলে বিভূতি আসুক না ?

চৌধুরি মশায় কেমন আছে জানো ?

পূর্ণেন্দু বলিল, ভালো নয়।

শুনিয়া পাঁচজনে আরও ভড়কাইয়া গেল। এবং আরও স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে কীর্তন যখন চলিতেছে আসর ছাড়িয়া যাওয়া কোনোমতেই সঙ্গত হইবে না। আশেপাশের দু-একজন এতক্ষণে গোলমালের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ণেন্দু উঠিয়া গেল।

তারপর ঘটিল অতি খাপছাড়া নাটকীয় ব্যাপার। লোকজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া বিভূতি আর তার সঙ্গীরা অপরাধী পাঁচজনের কাছে আগাইয়া গেল। চার-পাঁচজনে মিলিয়া এক একজনকে ধরিয়া হাঁচকা টান মারিয়া দাঁড় কবাইয়া দিল। পাঁচজনের মুখ তখন পাংশু হইয়া গিয়াছে। কীর্তন বন্ধ হইয়া গেল, সকলে অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

বিভূতি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এই পাঁচটি গুন্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাপকে বিনা দোষে মেরে প্রায় খুন করে ফেঙ্গোছে। আজ সকাল পর্যন্ত বাবা অজ্ঞান হয়েছিলেন। আপনাদের সকলের সামনে আমি এদের শাস্তির বিধান করছি, চেয়ে দেখুন। বলিয়া একদিন সদানন্দের মুখে যে রকম ঘৃষি লাগাইয়াছিল কালীপদর মুখে সেইরকম একটা ঘৃষি বসাইয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিল বটে কিন্তু মারটা তেমন জমিল না। ভয়ে যারা আধমরা হইয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া গৌণ্ডাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত তুলিয়া একটা আঘাত ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা পর্যন্ত যাদের নাই, একতরফা তাদের কাঁহাতক পিটানো মানিক ৩য়-২৬

যায় ? এমনি মারিতে হাত উঠিতেছে না দেখিয়া বিভূতি একজনের একটা ছড়ি কুড়াইয়া নিল, তারপর সেই ছড়ি দিয়া পাঁচজনকে মারিতে আরম্ভ করিল।

এতক্ষণে চারিদিকে হইচই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মারের ভয়ে আশেপাশের সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইয়া চিন্তাইতেছে। সদানন্দই বোধ হয় সকলের আগে তাদের কাছে আগাইয়া আসিল। সদানন্দকে আগাইতে দেখিয়া তখন অগ্রসর হইল আশ্রমের অধিবাসীরা।

সদানন্দ বিভূতিকে ধরায় বিভূতি তাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। তখন সকলের দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিতে লাগিল, আমার আশ্রমে এসে একজন গুস্তা গুস্তামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা চূপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমাদের সহ্য হচ্ছে ? আমার যদি একজন ভক্ত এখানে থাকে—

উত্তেজনা অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল, তার উপর সদানন্দের অনুপ্রেরণা। একটা গর্জনের মতো আওয়াজ উঠিয়া এলোমেলো গোলমালটা একেবারে ঢাকিয়া দিল। শ-চারেক লোক আগাইয়া গেল বিভূতি আর তার সঙ্গীদের দিকে। বিভূতির দলে যে বিশেষ ভারী নয় সেটা টের পাইয়া সকলের মধ্যেই অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। বাকি পাঁচশো-ছশো লোকের মধ্যে তিন-চারশো স্ত্রীলোক আর্তনাদ করিতে লাগিল, বাকি সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা।

মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল : মার শালাদের। এই মহামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া বাঙালি দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি আরম্ভ করিতে পারে না।

জনতা যখন আক্রমণ করে তখন দেরি হয় শুধু আরম্ভ কবিতো, একজন যতক্ষণ আসল ব্যাপারটা হাতেনাতে শুবু করিয়া না দেয় ততক্ষণ চলিতে থাকে শুধু হইচই আশ্রমালয়। তবে এ রকম অবস্থায় আরম্ভ হইতেও যে খুব বেশি দেরি হয় তা নয়, দু-এক মিনিটের মধ্যেই কাবও না কাবও উত্তেজনা চরমে উঠিয়া যায়। ব্যাপার যে কী রকম গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিভূতি আব তার সঙ্গীরা ভালো করিয়াই টের পাইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এখন আর উপায় কী ? পালানোর চেষ্টা করিলে কয়েকজন বাঁচিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পালানোর চেষ্টা তো আর করা চলে না। তাব চেয়ে উন্নত জনতার হাতে মরাই ভালো।

পালানোর চেষ্টা করা চলে না কেন ? বিভূতির ভক্তরা সকলে কী মনে করিবে ! মানুষের নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরির দুর্বলতা দেখিয়া সেদিন সকালে বিভূতির লজ্জা আর দুঃখ হইয়াছিল, এখন সে চোখের পলকে বুঝিতে পারে, অনুগত যুবক সমাজের নিন্দা-প্রশংসার ভাবনাই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাদের এত বড়ো বড়ো কথা শুনাইয়াছে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বুক ফুলাইয়া যাদের সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসিয়াছে, এখন বিপদ দেখিয়া তাদের ফেলিয়া পালানোর কথা ভাবিতেই হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছে। অথচ এ ভাবে মরণকে বরণ করা নিছক বোকামি। রেল লাইনে ট্রেনের সামনে দাঁড়াইয়া সাহস দেখানোর মতো।

সদানন্দও নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। দু-হাত মেলিয়া বিভূতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে ঠেকানোর কল্পনাটা মনের মধ্যে আসিয়াই অন্য একটা কল্পনার তলে মিলাইয়া গেল। চোখের সামনে এমন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটতে যাইতেছে, অথচ এই অবস্থাতেও সদানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে জগতে মাধবীলতার একজন মাত্র মালিক আছে, তার নাম বিভূতি। বিভূতির যদি কিছু হয়, মাধবীলতার তবে কেউ কর্তা থাকিবে না। চিন্তাটা মনে আসিতে সদানন্দ একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘটিল আরেকটা কাণ্ড। হাতে আর মাথায় ব্যাভেজ বঁধা মহেশ চৌধুরি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পাগলের মতো আসিয়া হাজির হইল। খানিকটা তফাতে হইতেই সে প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল, ওরে, রাখ, রাখ। ওরে বিভূতি, রাখ।

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কতকটা বিষ্ময়ে, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা সহানুভূতিতে। বিভূতি প্রথমে সকলকে শুনাইয়া যা বলিয়াছিল, মহেশ চৌধুরিকে দেখিয়া সেই কথাগুলি মনে পড়িয়া গিয়াছে।

উনিশ

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। এবার আরও জোরে। আসরে মহেশ চৌধুরিরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল, তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, মহেশ চৌধুরি আত্নত্যাগের সুরে বিভূতিকে হাঙ্গামা থামাইতে অনুরোধ করে নাই, বিভূতিকে রক্ষা করার জন্য তার অনুগতদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। বাপের আত্নত্যাগ বিভূতির কানে পৌছায় নাই। গোলমালের জন্য নয়, সে তখন প্রায় সদানন্দের পায়ের কাছেই উদ্ভট ভঙ্গিতে পড়িয়া আছে, বাঁ হাতটা কবজি ছাড়াও আরেক জায়গায় ভাঁজ হইয়া শরীরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে আর ডান হাতটা টান হইয়া নিবেদনের ভঙ্গিতে আগাইয়া গিয়াছে সদানন্দের পায়ের দিকে। শরীরটা রক্তমাখা, তবে কোনো কোনো অঙ্গের নড়নচড়ন দেখিয়া বুঝা যায় তখনও মরে নাই। আরও অনেকে উৎসাহ হইয়াছে, সকলে তারা বিভূতির সঙ্গীও নয়, সদানন্দের মান রক্ষার জন্য তার যে সব উৎসাহী ভক্তেরা আগাইয়া আসিয়াছিল তাদের মধ্যেও কয়েকজন অন্য উৎসাহী ভক্তের হাতে মার খাইয়াছে। মারামারির সময় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই দু-বা দিতে এমন হাত নিশপিশ করে !

শুধু হাতের মার নয়, গ্রামের লোকের পথ চলিতে লাঠিব বড়ো দরকার হয়।

মারামারির দ্বিতীয় খণ্ডটা পরিণত হইয়া গেল রীতিমতো দাঙ্গায়, কেউ ঠেকাইতে পারিল না। অনেকে আগেই পালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যাপার এতদূর গড়াইবে না আশায় বুক বাঁধিয়া যারা অপেক্ষা করিতেছিল, এবার তাবাও ছিটকাইয়া সবিয়া গেল। কেউ সটান পা বাড়াইয়া দিল বাড়ির দিকে, কেউ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। কেউ মাটির ঢেলা ইট পাটকেল, হাতের কাছে যা পাইল, দূর হইতে তাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে—একটু আগেও যেটা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্তনের আসর। খানিক তফাতে একটা চালাকাঠের স্তূপ ছিল, আট-দশজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু-হাতে চালাকাঠ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল—ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়, একপাশে সেখানে তখনও সমবেত স্ত্রীলোকদের অর্ধেকের বেশি নিরুপায় আতঙ্কে কিচিরমিচির সুরে আত্নত্যাগ করিতেছে। কোনো অল্পবয়সি স্ত্রীলোক পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বিফল দৃষ্টিতে চারিদিকে প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে বাবাগো মাগো বলিয়া আর কোনো বয়স্ক স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়াই মধুসূদনকে ডাকিতেছে। মেয়েদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। আসরের চারিদিকে রাত্রি আর নির্জনতা, পালাবার উপায় নাই। কয়েকজন অবশ্য দাঙ্গার সূচনাতাই উন্মাদিনীর মতো যেদিকে পারে ছুটিয়া পালাইয়াছে, সকলে সে রকম উদ্ভ্রান্ত সাহস কোথায় পাইবে ? পুরুষ অভিভাবকরা আসিয়া অনেককে উদ্ধার করিয়া নিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উদ্ধারের কাজটাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে আরও কঠিন। নিজেদের সংকীর্ণ সীমানাটুকুর মধ্যে অনেকে ভয়েব তাড়নায় কয়েকটি পলাতকা উন্মাদিনীর মতোই দিশেহারা হইয়া এদিক ওদিক আরম্ভ করায় নিজেরাই হারাইয়া গিয়াছে। তারপর আছে ছোটো ছেলেমেয়ে। তারপর আছে শাফা দেওয়ার, গা মাড়াইয়া দেওয়ার বচসা আর গালাগালি। যে দু-একজন অভিভাবক লজ্জা ভয় ভদ্রতা ছাড়িয়া একেবারে মেয়েদের মধ্যে আসিয়া খোঁজ করিতেছে, খোঁজ পাইয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কাছে আনাইয়া সঙ্গ করিয়া পালাইতে তারও সময় লাগিতেছে অনেকটা।

এই অবস্থায় চ্যালাকাঠগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল তাদের গায়ে মাথায়।

কেউ থামানোর চেষ্টা না করিলেও দাঙ্গা আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কোনোটা তাড়াতাড়ি থামে, কোনোটার জের চলে এখানে-সেখানে ছাড়া ছাড়া হাতাহাতিতে, পিছন হইতে মাথা ফাটানোয়। এ দাঙ্গাটা থামাইয়া দিল বিপিন। আশ্রমে একটা লুকানো বন্দুক ছিল। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তবু বন্দুকটা লুকানোই থাকিত। ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা আনিতে বিপিনের সময় লাগিল মিনিট পাঁচেক আর খানিকটা তফাতে দাঁড়াইয়া কয়েকবার আওয়াজ করিতে সময় লাগিল দু-মিনিট। শেষ মিনিটের আওয়াজ দরকার ছিল না, এ ধরনের শব্দের দাঙ্গা থামাইতে একটা বন্দুকে এক মিনিটে যে কটা আওয়াজ করা যায় তাই যথেষ্ট।

দাঙ্গা থামার পরে হাঙ্গামার প্রথম বীভৎস আর বিশৃঙ্খল অবস্থাটাও শেষ হইয়া গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। এ-রকম হাঙ্গামার ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে সদানন্দের আশ্রমবাসী শিষ্য-শিষ্যানদের পটুতা দেখা গেল অসাধারণ। পরিচালনার ভারটা নিতে হইল বিপিনকে, সদানন্দের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, সেও মার খাইয়াছে। মেয়েদের শাস্ত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং আহতদের প্রাথমিক শুল্ক্যার ব্যবস্থা করা হইল।

আধঘন্টা পরে দেখা গেল আসরে আছে শুধু আশ্রমের লোক, আহত আর নিহতদের আত্মীয়স্বজন, আর আছে গহনার শোকে কাতর কয়েকজন নরনারী। মধ্যে যারা চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিতেছিল দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পালাইতে পারে নাই, একটা চ্যালাকাঠ কুড়াইয়া নিয়া রক্তাবলী দুজনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

আনকোরা নূতন আঘাতের রক্তমাখা চিহ্ন গায়ে নিয়া সদানন্দ আর পুরানো আঘাতের ব্যাভেজ বাঁধা চিহ্ন গায়ে নিয়া মহেশ চৌধুরি জড়ভরতের মতো এক রকম কাছাকাছিই বসিয়া আছে, বিভূতির গা ঘেঁষিয়া। দাঙ্গা শেষ হওয়ার একটু আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে অথবা একটু পরে বিভূতি মরিয়া গিয়াছে। এক মিনিট স্তব্ধতার আগের তিন মিনিট আর পরের সাত মিনিট, মোট দশ মিনিটের দাঙ্গায় মারা গিয়াছে চারজন। গুরুতর আঘাত পাইয়াছে সাতজন আর সাধারণভাবে আহত হইয়াছে সতেরো জন। আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে তারা এখানে নাই, আগেই সরিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দ আর মহেশ আহতদের প্রাথমিক সেবা-শুল্ক্যার পর প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন চাহিয়া দেখিতে থাকে আর শূনিতে থাকে মরা ও আধমরা মানুষগুলিকে ঘিরিয়া বসিয়া মেয়েদেব ডুকরানো কান্না আর পুরুষদের হায় হায় আপশোশ। সদানন্দের মাথার মৃদু ঝিমঝিমার মধ্যেও মনে হয়, এতগুলি গলার কান্না আর আপশোশের শব্দ থামা সত্ত্বেও আসরটা যেন বড়ো বেশি নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভিড়ে যখন গমগম করিতেছিল আর খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তন চলিতেছিল তখনও আসরে যেন ঠিক এই রকম স্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল। মেয়েদের কান্না শূনিতে শূনিতে মহেশ চৌধুরির মনে হয় অন্য কথা—এই শোকের ছড়াছড়ির মধ্যে বিভূতি যেন অন্যান্য রকম ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে, তার জন্য শোক করিবার কেউ নাই।

অন্যায়টা শেষ পর্যন্ত তার বোধ হয় সহ্য হইল না, তাই মাঝরাত্রি পার হইয়া যাওয়ার অনেক পরে বিপিনকে ডাকিয়া বলিল, বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে পার বিপিন ?

পাঠাচ্ছি—সকালে পাঠালে ভালো হত না ? এত রাতে মেয়েদের—

না, এখনি খবরটা পাঠিয়ে দাও। মেয়েরা এসে একটু কাঁদুক।

সদানন্দ এতক্ষণ বারবার শুল্ক্যার আর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবার বিপিন অনুরোধ করিতেই রাজি হইয়া গেল এবং একজন শিষ্যের গায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজের তিন

মহল আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল একজন শিষ্যা। মনে হইল, এতক্ষণ অন্য সব আহতদের মতো কেবল সার্থারণ শূশ্রূষা আর চিকিৎসা পাওয়া যাইত বলিয়া সে গ্রহণ করে নাই, এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়ায় সকলের চোখের আড়ালে সেটা উপভোগ করিতে যাইতেছে।

এদিকে কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে মহেশের মনে হইতে লাগিল, বাড়ির মেয়েদের আসিতে বড়ো বেশি দেরি হইতেছে। তাই, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজেই হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, সদানন্দের সামনে ছেলের জন্য কাঁদিতে এতক্ষণ তার যেন লজ্জা করিতেছিল, এবার সুযোগ পাওয়ায় প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভূতির মা, মাধবীলতা আর বাড়ির সকলে আসিল প্রায় শেষ রাত্রে। কিন্তু তেমনভাবে কেউ কাঁদিল না। মাধবীলতা একরকম হাঁ করিয়া বিভূতির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দেই বাকি রাতটুকু কাবার করিয়া দিল। বিভূতির মা এত আস্তে কাঁদিতে লাগিল যে একটা কান ব্যাভেজে ঢাকা না থাকিলেও পাশে বসিয়া মহেশ চৌধুরি সব সময় তার কান্নার শব্দ শুনিত পাইল না।

পুলিশ আসিল সকালে।

পুলিশের লোকের কাছে একটা খবর পাওয়া গেল, ইতিমধ্যেই তারা তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দাঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় আশ্রমের যে ছোটো ফুলের বাগানটি আছে সেখানে পাঁচজন লোক কাল রাত্রে একটি এগাবো বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে, দুজন পলাতক।

না মরেনি, বেঁচে উঠবে বলেই তো মনে হয় মেয়েটা। তবে কী জানেন বিপিনবাবু—

মহেশ চৌধুরি শুনিতোছিল, হঠাৎ তার মনে হইল দাঙ্গার চেয়ে এই মেয়েটির আলোচনাই সকলে যেন বেশি উপভোগ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, জগতের কোথাও না কোথাও সর্বদাই যে কুবুক্ষেত্রীয় কাণ্ড চলিতেছে তাব তুলনায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা শোচনীয়ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু এগারো বছরের একটি রক্তমাংসের বিন্দুতে তীব্র আর বীভৎস অস্বাভাবিকতার সিদ্ধু খুঁজিয়া মেলে, বোমাধ্বংসকর লজ্জা ভয় রাগ দ্বেষ ঘৃণা আর অবাধ্য আবেগে স্নায়ুগুলি টান হইয়া যায়, কানে ভাসিয়া আসে লক্ষ কোটি পশুর গর্জন।

মহেশ চৌধুরি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া এক চোখে চারিদিকে চাহিতে থাকে। আহতদের অনেক আগেই ভালো আশ্রয়ে সবানো হইয়াছে, পড়িয়া আছে। সবল তিনটি সাদা চাদর-ঢাকা দেহ। এত বয়সে এত কাণ্ডের পর এ রকম আবেষ্টনীতে এমন অসময়ে একটা জনা কথা নুতন করিয়া জানিয়া নিজেই তার বড়ো অসহায় মনে হইতে থাকে। চাপা দিলে সতাই রোগ সারে না, হিমালয় পাহাড়ের মতো বিরাট এক স্তূপ সুগন্ধি ফুলের নীচে চাপা দিলেও নয়।

[লেখকের মন্তব্য : মহেশ চৌধুরির এই অস্পষ্ট আর অসমাপ্ত চিন্তাকে মহেশ চৌধুরির চিন্তার শক্তি ও ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে গেলে অনেক বাজে বকিতে হইবে, সময়ও নষ্ট হইবে অনেক। আলপিন ফুটাইয়া খাঁড়ার পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশি কাজে লাগবে মনে হয়।

মোট কথা, মহেশ চৌধুরির মনে হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু-একজন মহা-... যুগ এবং সব সময় অনেক ছোটোখাটো মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোনো ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালোর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ-ঘি খাওয়াইয়া বুগিকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না, তারা নিজেরাও বুগি। না হইয়া উপায় কী? মানুষ হইতে যে মানুষের জন্ম, মানুষের কাছ হইতে

খুঁটিয়া খুঁটিয়া যার আত্মসংগ্রহ, মানুষের যা আছে তা ছাড়া মানুষের যা নাই তা সে কোথায় পাইবে ? উপাদানগুলি সেই এক, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ শুধু নিজের মধ্যে ভিন্নভাবে আত্মচিন্তার খিচুড়ি রাঁধে।

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরিবকে স্বপ্নে বড়োলোক করার চেষ্টার মতো দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।

জগতের কোটি কোটি অন্ধকে অন্ধের পথ দেখানোর চেষ্টার করুণ দিকটা মহেশ চৌধুরিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। হতাশায়, অবসাদে সমস্ত ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হয়। কেউ খুঁজিয়া পাইবে না, মানুষের মুক্তির পথ কেউ পাইবে না।

মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেই জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরিও তা জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।]

দাঙ্গাহাঙ্গামার জের চলিতে লাগিল, মহেশ চৌধুরিও বিবাদ ও অবসাদের ভায়ে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের ভালো নাই, এ কথা ভাবিলেই তার মনে হয় পৃথিবীসুদ্ধ আত্মভোলা লোক ভালোমন্দে জড়ানো জীবন মনের আনন্দে বাঁচিয়া আছে, সেই কেবল পশুর খাঁচায় আটক পড়িয়াছে। সকলে ভাবে পুত্রশোকে মহেশ কাতর, মহেশ ভাবে, পুত্রশোকে সে যদি সকলের মতো রীতিমতো কাতর হইতে পারিত ! একটিমাত্র ছেলে, তার শোকেও আত্মহারা হইতে পারিতেছে না, এ কী ভয়ানক অবস্থা তার ? শোক বাড়ানোর জন্যই মহেশ সর্বদা বিভূতির কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, গৃহ কেমন শূন্য হইয়া গিয়াছে অনুভব করার চেষ্টা করে, বিভূতির স্মৃতিচিহ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে, বারবার মাধবীলতার নূতন বেশের দিকে তাকায।

কেবল শোক বাড়ানোর জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়।

মহেশ চৌধুরির শোক দেখিয়া বাড়ির লোকের বুক ফাটিয়া যায়। বিভূতির মা মাথা নাড়িয়া বলে, ও আর বাঁচবে না না বাঁচুক, আর বেঁচে কী হবে ? এব আগেই যেন আমি যেতে পারি, হে মা কালী, ওর আগেই যেন—তোর মতো বেশ যেন ধরতে না হয় রাফুসি।

মাধবীলতার শোকটা তেমন জোরালো মনে হয় না। তাকে কেবল একটু বেশি রকম ব্যস্ত দেখায়, তেল মাখিয়া স্নান না করার ব্যস্ততা নয়, ভিতর হইতে রস শুকাইয়া যাইতে থাকিলে যেমন হয়।

অনেক ভাবিয়া একদিন সে মহেশ চৌধুরির সামনে জোড়াসন করিয়া বসে, আগে মাথাব ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বলে, ওই লোকটাই খুন করেছে বাবা।

স্বামীজি ?

‘ওই লোকটা’ বলিতে মাধবীলতা যে কাকে বুঝাইতেছে অনুমান করিতে মহেশের দ্বিধা পর্যন্ত করিতে হয় না।

হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে, তুমি তো যাওনি।

লোকের কাছে শুনছি। আপনিও তো জানেন ? ওই তো সকলকে খেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—

খুন করতে বলেননি, বলেছিলেন—

মাধবীলতা অসহিষ্ণু হইয়া যায়, তার মানেই তো তাই। এ লোকটা আমায় অপমান করছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে—ও কথা বলে সকলকে খেপিয়ে দেওয়ার আর কী মানে হয় ? কী অপমান করছে সবাই তো দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল ? কেউ তখন আর মারতে উঠেনি কেন ? যেই সকলকে ডাকল তখন সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল কেন ?

মহেশ চৌধুরি ধীরভাবে বলে, উনি হয়তো ওকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।

মাধবীলতা আরও ব্যাকুল হইয়া বলে, না না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকেরা তাড়াতে পারত না ?

দল নিয়ে গিয়েছিল যে ?

অগত্যা মাধবীলতাকে ধৈর্য ধরিতে হয়, শাস্ত হইতে হয়। সব কথা বুঝাইয়া না বলিলে মহেশ চৌধুরি বুঝিতে পারিবে না। এমন ভালো মানুষ কেন যে সংসারে জন্মায়।

তা নয়, দলে আর কজন ছিল ? ওঁকে খুন করাই ও লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই ? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।

এবার মহেশ চূপ করিয়া চাহিয়া থাকে। একজন স্ত্রীলোককে পাওয়ার লোভে তার স্বামীকে হত্যা করা দুর্বেদ্য ব্যাপার নয়, তবু যেন মহেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ও রকম হত্যাকাণ্ডগুলি অন্যভাবে হয়। বিভূতিকে সদানন্দ জানিত না। বিভূতি নিজে হইতে গিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল। এ রকম অবস্থায় সদানন্দের সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ানক কথা অনুমান করা চলে কেমন করিয়া ?

মহেশের মুখ দেখিয়া মাধবীলতার শরীর রাগে রিরি করিতে থাকে। এমন অপদার্থ হাবাগোবা ভালো মানুষও পৃথিবীতে জন্মায় !

বুঝতে পারছেন না ? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কী করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়া মাত্র—যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে খেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেবে ফেলবে অমনি সকলকে খেপিয়ে দিল।

তা বটে, সুযোগ পাওয়া মাত্র সুযোগেব সদ্ব্যবহার করা সদানন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু—। মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চূপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে আব মাধবীলতা ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা কেন যে মানুষ বুঝিতে পারে না। বিভূতিকে বাঁচাইতে দুহাত বাড়াইয়া আগাইবার উপক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ যে চিন্তা মনে আসায় সদানন্দ পিছাইয়া গিয়াছিল, মাধবীলতা সেই চিন্তাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সদানন্দের জীবনের দিনে মাসে বৎসবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সদানন্দ এই কথাই সর্বদা চিন্তা করিত, কী করিয়া বিভূতিকে মারিয়া মাধবীলতাকে লাভ করা যায়। মাধবীলতাকে হাবানোর পব মাধবীলতাকে পাওয়ার চিন্তা ছাড়া সদানন্দের কি অন্য চিন্তা থাকিতে পারে ?

কুড়ি

প্রথমটা একটু উত্তেজিত হইয়াছিল, তাবপর কিন্তু মহেশ চৌধুরি অস্বাভাবিক রকম শান্ত হইয়া পড়িল। একেবারে শান্তির প্রতিমূর্তি। মুহূর্তের জন্যও তার মুখের চামড়া কঁচকায় না, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হয় না, কথায় আলো প্রকাশ পায় না। আরও বেশি আস্তে চলাফিরা করে, আরও বেশি ধীরতার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিয়া যায়।

মাধবীলতা দাঁতে দাঁত কামড়ায়।—আপনি কিছুই করবেন না ?

করব।

কী করবেন ?

কী করব তাই ভাবছি মা।

মাধবীলতা রাগে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।—আপনার কিছু করা উচিত কিনা তাও ভাবছেন বোধ হয় ?

মহেশ চৌধুরির স্পষ্ট, মৃদু ও একটানা আলাপ করার সুর বদলায় না। ভাবছি বইকী। সব কথা না ভেবে কি কিছু করতে আছে ? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ।

আগে কোনোদিন মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে সদানন্দ বলে নাই। সে অনায়াসে নামটা উচ্চারণ করিয়া গেল, খাপছাড়া শোনাইল মাধবীলতার কানে—সে নিজেই মহেশ চৌধুরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে ও নামটা খুনির।

স্বামীজির দোষ আছে বলেই—

দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা ?

মাধবীলতা বড়ো দমিয়া গেল, মুখখানা হইয়া গেল ফ্যাকাশে। মহেশ চৌধুরি কেন তাকেও দোষী করিতেছে অনুমান করা কঠিন নয়। এ দিকটা আগে সে ভাবিয়া দ্যাখে নাই।

তুমি আগেও ভাবতে সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে বিভূতিকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগেনি। তোমার কোনো দোষ না থাকলে এ সব কথা ভাবতে কেন ?

আমি—

তোমার কী দোষ তুমি জান না ? অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মহেশ চৌধুরি যেন তাব অক্ষমতাকে সমর্থনই করে, সেইখানে তো মুশকিল বাছ। নিজে দোষ যদি আমরা জানতে পাবতাম তবে আর ভাবনা ছিল কী। আমি কি আমার দোষ জানি ?

মাধবীলতা বড়ো দমিয়া যায়। কী ভাবিতেছে মহেশ চৌধুরি ? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কী ধারণা জাগিয়াছে তার সম্বন্ধে তার মৃত স্বামীর পিতার মনে ? কী সন্দেহ করিয়াছে এই হাবাগোণা ভালোমানুষটি,—মাঝে মাঝে যাকে মারাত্মক রকমের চালাক মনে হয় ? তাব ছেলের বউকে পাওয়ার লোভে সদানন্দ ইচ্ছা করিয়া তার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়াও মহেশ চৌধুরির অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবীলতার আর রাগ করিবার সাহস হয় না। তা ছাড়া, এতক্ষণে তার মনে হইতে থাকে যে মহেশ চৌধুরির করিবারই বা কী আছে, সে কী কবিতাে পারে ? প্রথমে মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরি আসল ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিলেই বুঝি সদানন্দের শাস্তির আর সীমা থাকিবে না। এখন মাধবীলতা ভাবিয়া পায় না, এমন একটা বিশ্বাস তার কেন জাগিয়াছিল। প্রতিহিংসা নেওয়ার মানুষ মহেশ চৌধুরি নয়, সে ক্ষমতাও তার নাই।

দাঙ্গার ফলে আর কিছু না হোক আশ্রমের নাম আবও বেশি ছড়াইয়া গিয়াছে। কেবল কাছাকাছি গ্রাম আর শহরের মানুষের মধ্যেই-ব্যাপারটা নিয়া হইহই হয় নাই, খবরের কাগজেও বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইয়াছে। দাঙ্গার বিবরণ শুধু নয়, আশ্রম সম্পর্কেও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একটি কাগজে লেখা হইয়াছে : এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীশ্রী সদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল তপস্যার পর জনসেবাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিয়া রোগশোকদারিদ্র্যানির্পীড়িত নরনারীর কল্যাণের জন্য ইত্যাদি। সকল মহৎ কর্মের বিরোধিতা করাই এক শ্রেণির লোকের প্রকৃতি, এইরূপ একদল লোক অন্যভাবে আশ্রমের ক্ষতি করিতে অসমর্থ হইয়া আক্রোশের বশে আশ্রমের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন গুন্ডা ভাড়া করা ইত্যাদি। এই বিবরণটি যে কাগজে বাহির হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরির বাড়িতে সেই কাগজটিই রাখা হয়। বাড়িতে খবরের কাগজটি আসামাত্র সকলের আগে মাধবীলতা সেটিকে দখল করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কোনো বিবরণ তার অজানা নয়, ব্যাপারটার জের কী দাঁড়াইতেছে তাও খবরের কাগজে বাহির হওয়ার কয়েকদিন আগেই তার কানে

আসে, তবু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত আর ভুল বিবরণ পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতে থাকে। সদানন্দ, তার আশ্রম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে অভিনব টীকা পড়িয়াই কাগজটি হাতে করিয়া সে মহেশ চৌধুরির কাছে ছুটিয়া যায়।

দেখেছেন কী আরম্ভ করেছে ওরা ? পড়ে দেখুন।

মহেশ ধীরে ধীরে আগাগোড়া পড়িয়া বলে, সদানন্দের তপস্যা আর আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা সত্য, গুন্ডা ভাড়া করার কথাটা সত্য নয়।

মাধবীলতা বোমার মতো ফাটিয়া যায়, একটা কথাও সত্য নয়। ও লোকটা কত খারাপ আপনি জানেন না, যে সব কাণ্ড চলে—

মহেশ বলে, জানি মা সব জানি। সদানন্দ অনেক সাধনা করেছে, তবে কী জানি মা, সাধকেরও পতন হয়। সদানন্দ লোক ভালো। আশ্রমটাও বড়ো উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ঠিক সে ভাবে কাজ হয়নি। মানুষের ভুলত্রুটি হয় কি না, বুঝবার দোষ হয় কি না নানাবকন—

মাধবীলতা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। সদানন্দ লোক ভালো ? আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ ? এত কাণ্ডের পর মহেশ চৌধুরিও যে এমন কথা বলিতে পাবে, কানে শুনিয়াও মাধবীলতার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, লোকটি বোধ হয় পাগল। প্রত্যেক উন্মাদের মতো নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে সে বাস করিতেছে আর বাস্তব জগতের অর্থ স্থির করিতেছে তার নিজের খাপছাড়া জগতের নিয়মে।

কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবীলতা অভিভূতের মতো বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে ?

মহেশ চৌধুরি একদিন আশ্রমে গেল। বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, বিভূতির দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু ?

ওরাও তো মারামারি কবেছিল।

তা কবেছিল কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হত না।

বিপিন চূপ করিয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হয়, লোকটা কি পাগল ? দাঙ্গা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরিয়াছে, বিভূতিকে নিজেব হাতে মাঝিয়াছিল এমন লোকও যাদের মধ্যে আছে, তারা শাস্তি পাইবে বলিয়া এই মানুষটার দুর্ভাবনা।

সেদিন সকালেই বিপিন আর সদানন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়িত্বটা ছিল বিভূতির। কিছুদিন আগে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহেশ চৌধুরি সদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার বাড়িতে নিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোনো ভালো উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বড়ো আশ্রমটির ক্ষতি করিবার জন্য একটি বিরোধী আশ্রম স্থাপন করাই মহেশ চৌধুরির আসল উদ্দেশ্য ইহা টের পাইয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বাপের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিভূতি এই হাঙ্গামা বাধায়। মহেশ চৌধুরিকেও দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া কিছুদিনের জন্য জেলে পাঠানোর চেষ্টা করার ইচ্ছা সদানন্দের ছিল, বিপিন কোনোমতেই রাজি হয় নাই। মহেশ চৌধুরির সম্বন্ধে বিপিনের মনের ভাব ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছিল।

বিকৃত সত্য বলিয়া জানিয়া যে আদালতে প্রমাণ করার জন্য সদানন্দের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিতেছিল, মহেশ চৌধুরি নিজে আসিয়া তাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সব দোষ ছিল তার ছেলের। বিভূতিকে দোষী প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে, তাদের ছিল স্বার্থরক্ষা বিভূতির দোষে কতকগুলি লোক জেলে যাইবে বলিয়া মহেশ চৌধুরির হইতেছে আপশোষ !

কিছু করা যায় না ?

কী করা যাবে বলুন ?

বিভূতির দোষটা আদালতে প্রমাণ করলে— ?

বিপিন ভাবিয়া বলিল, তাতে অন্য সবাই ছাড়া পাবে না, তবে শাস্তিটা কম হতে পারে।

মহেশ বলিল, তাই হোক। তা ছাড়া যখন উপায় নেই, কী আর করা যাবে।

সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা ঠিক হইয়াছিল সেটা মনে মনে বাতিল করিয়া দিয়া বিপিন বলিল, আদালতে কী বলবেন ?

যা সত্য তাই বলব, আর কী বলব ?

যা সত্য আদালতে তাই বলা হইবে স্থির হইলেও কী বলা যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা গেল। সকলে সত্য কথা বলিলেও সত্যের খুঁটিনাটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এমন পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আদালতে দাঁড়াইয়া মহেশ চৌধুরি ধীর স্থির শাস্তভাবে বলিয়া গেল, বিভূতি কেমন একগুঁয়ে ছিল, মেজাজটা তার কী রকম গরম ছিল, আগে একবার সে একটা ছোটোখাটো হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ফলে মহেশ কীভাবে কয়েকজনের হাতে মার খাইয়াছিল এবং বাপকে যারা মারিয়াছিল তাদের শাস্তি দিবার জন্য কীর্তনের আসরে গিয়া সে কীভাবে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ছেলের চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টাও করিল যে, কর্তব্যজ্ঞান, নিষ্ঠা, তেজ, সাহস এ সব মানুষের যতই থাক ভালোমন্দ উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলে ও সব কোনো কাজেই লাগে না।

অনেকে হতভম্বের মতো শুনিয়া গেল, কেউ ভাবিল মহেশ চৌধুরির মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কয়েকজন সেকৌতুকে হাসিতেও লাগিল।

বিভূতির মা বলিল, আদালতে দশজনের কাছে তুমি আমার ছেলের নিন্দে কবে এলে ! এবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমি অনেক সযেছি, আর সেইব না। বলিয়া মাথা ঝুটিতে লাগিল।

মাধবীলতাও বলিল, আপনার মনে এই ছিল ! আমিও গলায় দড়ি দেব। বলিয়া হু-হু কবিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মহেশ চৌধুরি তাদের বুঝাইয়া শাস্ত করিবার কোনো চেষ্টা করিল না, এতটুকু বিব্রত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না।

অপরাহ্নে বিপিন আসিল। মহেশ বলিল, এসো বিপিন।

বিপিন যেন হঠাৎ তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সন্মোহনের তারতম্যটা বিপিনও খেয়াল করিল কি না সন্দেহ, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের মতো সামনে বসিয়া পড়িয়া পরমাঙ্গীষের মতোই বিনা ভূমিকায় বলিল, কিছু ভালো লাগছে না।

মহেশ সায় দিয়া বলিল, অনেকদিন থেকেই তো তোমার মন খারাপ।

ছোটো ছেলে যেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় গুরুজনকে দুঃখ জানায় তেমনইভাবে বিপিন বলিল, আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম চৌধুরি মশায়। যা ভেবেছিলাম তা তো কিছু হলই না, একটার পর একটা হাঙ্গামাই বাধছে। কত বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে কী রকম আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কী দাঁড়াচ্ছে আশ্রমটা ! এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোলায় যাওয়া ঠেকাতে পারছি না।

মহেশ বলিল, কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আর সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তা তো বেড়েছে ? নাম ছড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তাও তো ছড়িয়েছে ?

বিপিন বলিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম তার যে কিছুই হচ্ছে না, বরং উলটো ফল হচ্ছে।

মহেশ বলিল, সে দোষটা তোমার।

বিপিন আহত হইয়া বলিল, আমার দোষ ? আমার কী দোষ ?

মহেশ বিপিনকে তার দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আগে বিপিন রাগ করিত, আজ নিঃশব্দে শুনিয়া যায়। মহেশের কথা শেষ হওয়াব আগেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, আপনাকে যদি আশ্রমে পেতাম !

পাবে।

আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন ?

দেব। কদিন আগেই ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা এবার আমিই নেব। মন দুর্বল কি না তাই ভাবছিলাম, ধীরে সূত্রে কদিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক দেরি করে লাভ কী, কী বলো ?

বিপিন অভিভূতের মতো বলিল, নিশ্চয়।

মহেশ বলিল, চলো তবে আজকেই যাই।

বিপিন ভয়ে ভয়ে বলিল, কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কী কবা যাবে ?

মহেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

সদানন্দ আর মাধবীলতাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থার অর্থ বিপিন এক রকম বুঝেনাছিল। সদানন্দকে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইবে এবং মাধবীলতাকে মহেশের কোনো আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মাধবীলতাকে অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিবার অর্থটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। মহেশের আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সদানন্দকে সরাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন জাগিতে পারে, মাধবীলতাকে সরাইয়া দিবার প্রয়োজন কী, কাৰণ কী ? মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সবাইয়া দিবার মতলব কবিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা কবিত্তে পারে নাই।

রাত্রি প্রায় দশটাব সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরি আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাব আসল উদ্দেশ্যটা তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাতে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথম দিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।

নৌকা চলিয়া গেলে মহেশ বলিল, আমরা সবাই মিলে এবার আশ্রমটা গড়ে তুলব বিপিন।